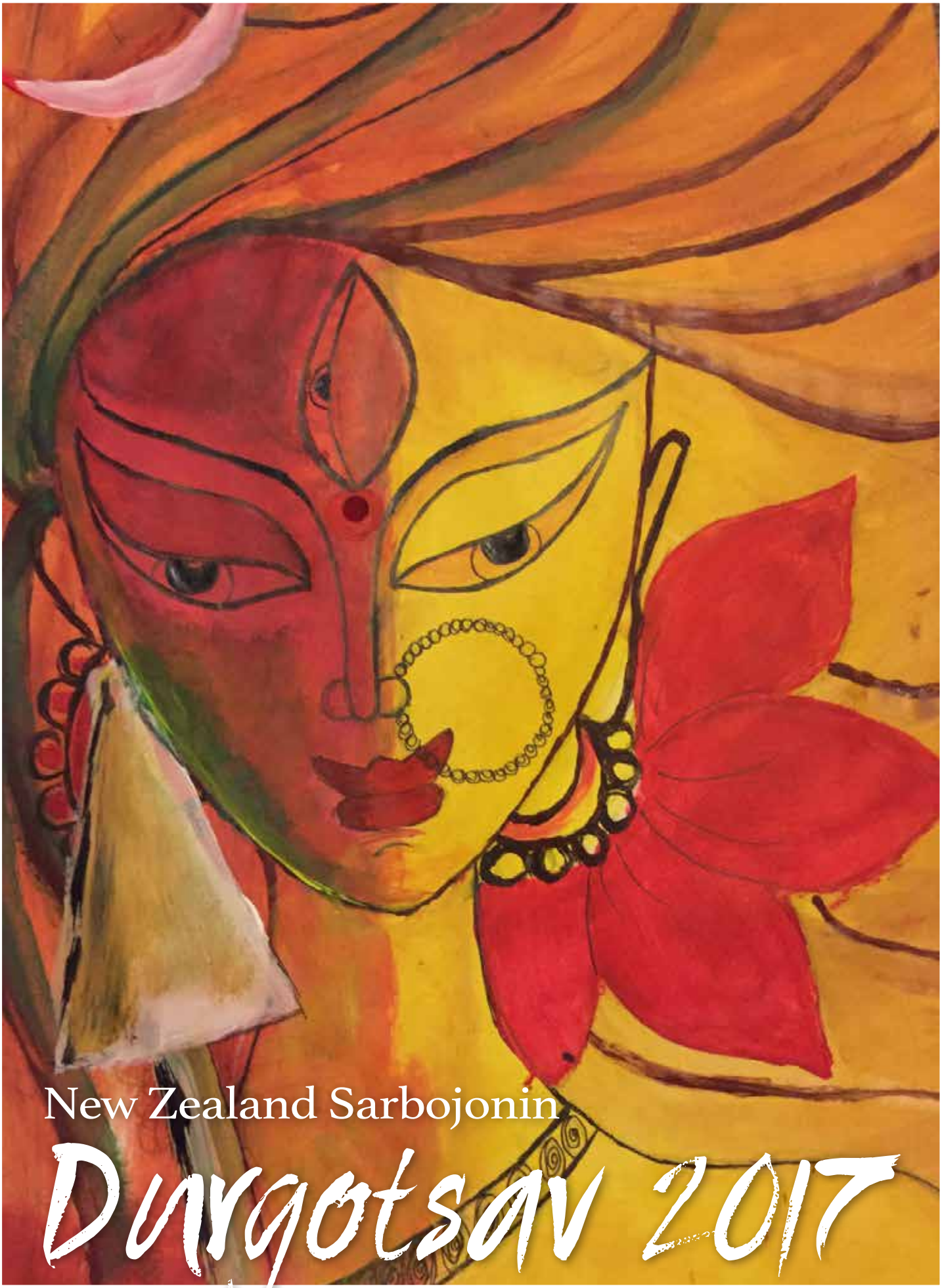

New Zealand Sarbojonin

Durgotsav 2017

Organised by

Probasee Bengalee Association, New Zealand

Largest Range of International Grocery in New Zealand

MANUKAU
43 Cavendish Drive
Manukau
Auckland, NZ
09 212 5656

HAPPY DIWALI
to all customers

Mt. Roskill
64 Stoddard Rd
Mt Roskill
Auckland, NZ
09 620 7557

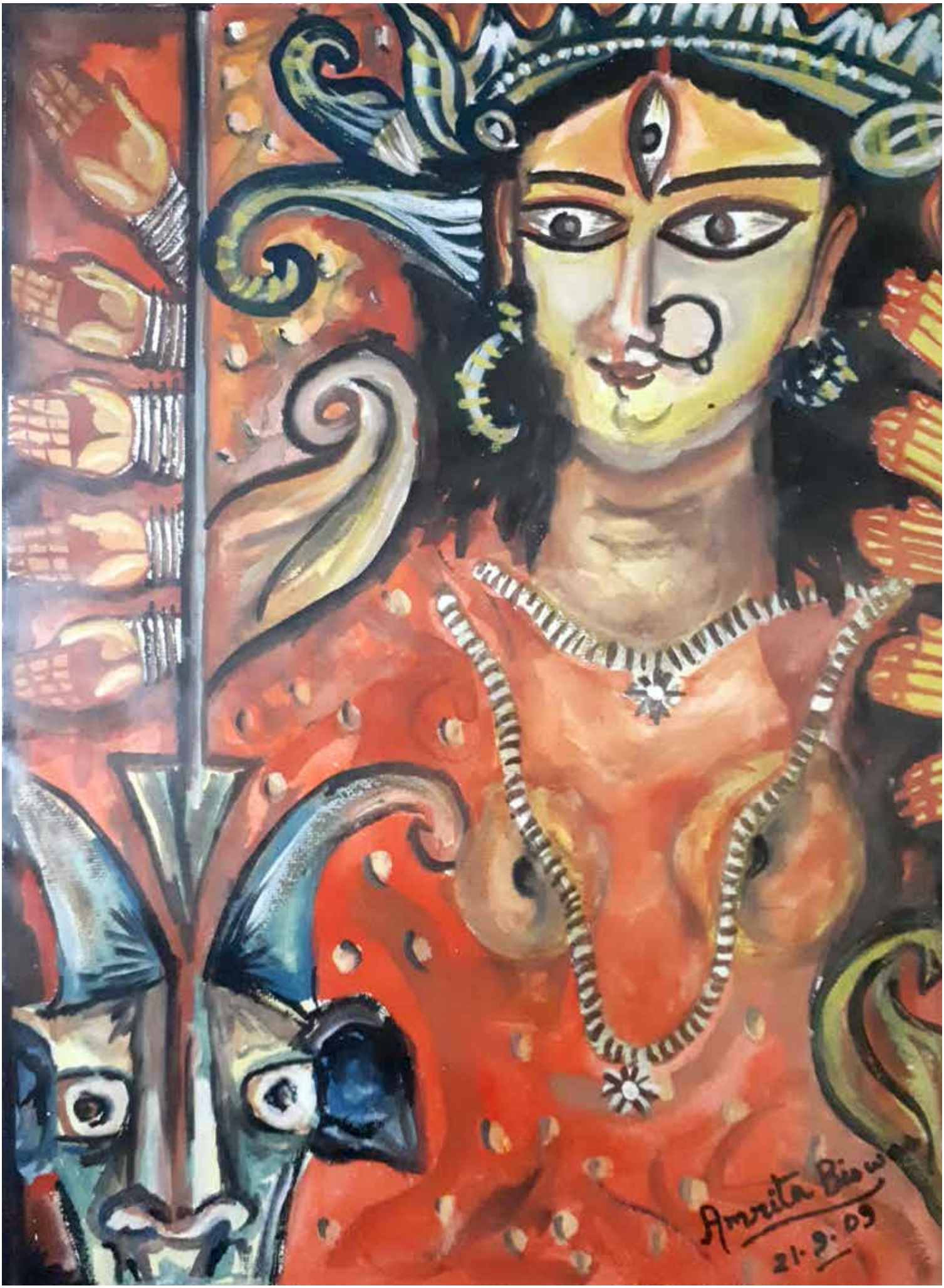

Painting by: Amrita Biswas

LOTUS FOREIGN EXCHANGE

CONVENIENT ~ AFFORDABLE ~ SPEEDY

No Commission or Fees on Currency Exchange

Foreign Exchange

Exchange your Foreign Currency and Travellers Cheques at best exchange rates

Telegraphic Transfers

Send Money to India

- Fee only $10
- No deduction at banks in India
- Draft delivery in India is also available at no extra charge

Send Money to Fiji

- Fee only $8

Send Money to Rest of World

- Send money to any Bank Account across the globe Fee only $15

MoneyGram

- Instant Money across the Globe
- Excellent Conversion Rate
- No Bank Account needed
- Reasonable Fees
- Real Value for your Money

MoneyGram. bringing you closer

Visit: www.lotusfx.com ~ Phone: 0800 44 22 88

LOTUS GOLD MERCHANTS LIMITED

Shop 74A, Westfield Shopping Mall, Manukau, Auckland
Phone: 09 263 4878, Fax: 09 262 2937, Email: info@lotusgold.co.nz
AND
Shop 108, Westfield Shopping Mall, Queensgate, Lower Hutt
Phone: 04 589 9584, Fax: 04 589 9583, Email: lotusgold_LHB@hotmail.co.nz
AND
Shop 27, LynnMall Shopping Centre, New Lynn, Auckland
Phone: 09 825 0122, Fax : 09 825 0129, Email: lotus_lmb@hotmail.com

Stunning range of 18 karat white & yellow Gold Diamond Jewellery

Wide range of 22 karat Indian Gold Jewellery plus:
Precious Stone Jewellery
Silver Jewellery
Gold & Silver Bullions
We buy old Gold ~ Free in-store assessment

Discover Lotus Gold today

Convenient parking

Finance Available

Open 7 Days
Late Nights: Thursday—Friday
Shop Online at: www.lotusgold.co.nz

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির সাথে সংস্কৃতির, উৎসবের সাথে ঋতুর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সম্পর্ক বহু পুরোনো। বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে শরৎ ঋতুর সংযোগ এত ব্যাপক, এত গহন, যে, এর তুলনা খুব কমই আছে। বঙ্গ জীবনের আনন্দযজ্ঞের নাম তাই আজ শারদোৎসব। দুর্গা পুজো তার আধ্যাত্মিকতা ও পৌরাণিক ব্যাখ্যার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে এখন তাই উৎসবে পর্যবসিত। বাঙ্গালীর জীবনে প্রতিবারই ফিরে ফিরে আসে এই চিরন্তন আত্মিক বন্ধনের শুভ মুহূর্ত। নতুন স্বপ্ন, আশা, আনন্দ সঞ্জীবিত করে তোলে আমাদের এই বঙ্গ জীবনকে। এই উৎসব কে আমরা ঘরে ফেরার সময় বলেই জেনে এসেছি বরাবর। ঘর কেবল অন্তরের না, ঘর ব্যক্তির, ঘর সমাজের। তাই ঘরের বাইরে বহু যোজন দূরেও বাঙ্গালি নিজের ঘরে ফেরে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে।

সাহিত্য শব্দটির উৎসে আছে সহিত এবং সেই শব্দটি এসেছে 'হিত' শব্দের সুত্র ধরে। পরস্পরের সহিত থাকার মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরের হিত সাধন করতে পারি। এই সত্যিই হোক শারদীয় উৎসবের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্রেই পরিশুদ্ধ হোক বাঙ্গালীর ঘর ও অন্তর। এই বছরটি ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশত বর্ষ, তাঁর প্রতি রইল আমাদের বিনীত প্রণাম ও শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রতি বছরের মত এই বছরও এই শারদ অর্ঘ্য টি রইল সবার জন্য।

শারদীয় শুভেচ্ছা সহ সম্পাদক মন্ডলী,

উপাসনা চৌধুরী
সিদ্ধার্থ রায়
কিশোর মিত্র
ঈশিতা দেব মিত্র

প্রেসিডেন্টের কলমে

জয়ন্ত ভাদুড়ী

দেখতে দেখতে আবার পূজো এসে গেলো, সময় যেন এক খরস্রোতা নদীর মতো , কখন কোথা দিয়ে আবার একটা বছর পার হয়ে গেলো বোঝাই গেলো না। প্রতিবার এর মত এবারও আমরা খুব ধুম-ধাম করে মা দুর্গার পুজোর আয়োজন করছি। নতুন জামা- কাপড় শাড়ী ও ধুতি পাঞ্জাবির খস-খস শব্দ আর কোলাহলে ভরে ওঠে আমাদের পুজো মন্ডপ। পূজোর সাজে চেনা মহিলারা হয়ে ওঠেন রহস্যময়ী, অচেনা। কি এক রহস্য যে আছে এই পূজোর সময়টা ঘিরে। এ এক আশ্চর্য সময়। মা দুর্গা তাঁর পরিবার বর্গ নিয়ে নেমে আসেন এই পৃথিবীতে। আকাশে বাতাসে তাঁরি মুর্ছনা।

অকল্যান্ডে এ বছর আমাদের পূজো ঊনত্রিশ'এ অক্টোবর থেকে। এটা আমাদের প্রবাসীর ছাব্বিশ 'তম পূজো। আশা করি প্রতি বছরের মত এই বছরও আমাদের পূজো খুবই সুন্দর ও সুষ্ঠো ভাবে হবে। সবাইকে জানাই পূজোর সাদর আমন্ত্রন ও শুভেচ্ছা। মায়ের কাছে প্রার্থনা সবাই যেন ভালো থাকে।পৃথিবী মঙ্গলময় হোক। পৃথিবীতে শান্তি আসুক।

CONTENTS

Ramkishna-Vivekanada'r Nivedita [রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা]	Amit Sengupta	7
Durga Pujo to Durgotsav: a journey	Poulamee Guha	11
Mohanagari Tomaye [মহানগরী তোমায়]	Swayam Sarkar	13
Realisation of Life as it Unfolds	Pavitra Roy	14
Rhodesia theke Zambia [রোডেশিয়া থেকে জাম্বিয়া]	Pritikana Mitra	16
India, Rajasthan through my eyes	Svetlana Banerjee	20
The Namesake and I	Ditoya Ghosh	22
Ekjon Sukhi Manush [একজন সুখী মানুষ]	Dilip Kumar Das	23
Ke Okhane [কে ওখানে]	Kishore Mitra	26
Poems	Various writers	32
Babar Moto Boro [বাবার মত বড়]	Sohom Sarkar	41
The Cricketer	Malisha Ghosh	42
All for the very first time	Shopan Dasgupta	43
Article on Dementia	Dr Rita Krishnamurti	47
Deb Debi O Tader Bahon [দেব দেবী ও তাদের বাহন]	Amit Sengupta	48
Castle and Kilts	Rijuta Chakraborty	57
Banglar Grand Canyon Gongoni [বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গনগনি]	Soumiya Gangulee	60
Phire Dekha [ফিরে দেখা]	Prova Ghosh	61
Giddey Shaheb [গিড্ডে সাহেব]	Dilip Kumar Das	64
Prakriti Dhongshokari Ashurder Binash Karo Ma [প্রকৃতি ধ্বংসকারী অসুরদের বিনাশ করো মা]	Soumiya Gangulee	67
Kothay Kothay Ahona [কথায় কথায় অহনা]	Interview	68
Rabindranath O Baul Gaan [রবীন্দ্রনাথ ও বাউল গান]	Rani Aklima	74
Probasee Annual Events (Photo Gallery)		75

Painting

Amrita Biswas

Rounak Giri

Agni Sen

Nirmita Ghosh

Upasana Chowdhury (Cover Art)

Pujo is here!!

Vijayendra Bose

Five days of laughter
Five days of fun
Ma Durga is here...
Our Durga Puja has begun!

Dancing and singing...
To the beats of the dhaak...
We venerate her divine light...
that salvages us from the dark

Forgive enmity...
Embrace it as a friend
Come lets celebrate together...
Bringing our differences to an end.

Fear, worry, forget it all..
For Mother is here to embrace us all...
To eliminate our fears...
And wipe our tears...
She is here to bless us all!

Why wait?
Get up and come along!
Lets welcome our Mother
Singing her favourite welcome songs

Jai Ma Durga!!!

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা
(জন্মের সার্ধশতবর্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন)
অমিত সেনগুপ্ত

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা" -এই নামেই তিনি সবসময় নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা (Margaret Elizabeth Noble) ছিলেন একজন আইরিশ বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। Northern Ireland-এর ছোট্ট শহর Dungannon-এ ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ঘটেছিল এই মহাজীবনের অবসান। তাঁর বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক এবং মায়ের নাম ছিল মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টন নোবেল। মার্গারেটই ছিলেন তাঁদের প্রথম সন্তান। তিনি ছাড়াও তাঁর আরও দুই বোন ও এক ভাই ছিল। তিনি তাঁর বাবার কাছে শিক্ষা পান যে 'মানব সেবাই, ঈশ্বর সেবা'। বাবার আদর্শ তাঁর পরবর্তী জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বাবা সঙ্গীত এবং শিল্পকলারও একজন বোদ্ধা ছিলেন।

মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন তাঁকে তাঁর দাদামশাই ও ঠাকুমার কাছে রেখে জীবিকার সন্ধ্যানে তাঁর বাবা-মা ডানগ্যানন ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টারে চলে যান। সেই সময় আয়ারল্যান্ড ছিল ইংল্যান্ডের শাসনাধীন। ইংল্যান্ডের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হবার জন্যে আয়ারল্যান্ডে চলছে গণ-জাগরণ। ফলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত। এই আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে উঠার সুযোগে মার্গারেটের মন প্রস্ফুটিত হয়েছিল বিপ্লবের স্বপ্নে। সেই স্বপ্ন লালিত হয়েছে দাদামশাই ও ঠাকুমার আদর্শ ও প্রেরণায়। জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল বাড়ির বৈপ্লবিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। কয়েক বছর পরে, তাঁর বাবা-মা কিছুটা স্থিত হলে মেয়েকে তাঁদের কাছে নিয়ে যান। মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। তারপর তাঁর দাদামশাই তথা আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হ্যামিলটনই তাঁকে লালন-পালন করেন।

হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের ছাত্রী, মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র তেরো, তখন তিনি সাহিত্যের শিক্ষিকা মিস কলিনকে একটি প্রশ্ন করে চমকে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জীবনের শেষ কোথায়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি?" অতটুকু মেয়ের মুখে গভীর জীবনবোধের এমন প্রশ্ন মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। তবে প্রতিভা তো এমন বিশেষ পথ ধরেই এগোয় - গতানুগতিক পথ তো তার নয়। এই একটা প্রশ্নের মধ্য থেকেই সেদিন তাঁর প্রতিভার পরিচয় পান সেই দূরদর্শিনী শিক্ষিকা, মিস কলিন। যদিও সেদিন মিস কলিন মার্গারেটের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেননি।

সেই শিক্ষিকাকে একদিন মার্গারেট জানালেন, ঈশ্বর যে আছেন তা বিশ্বাস করতে তাঁর ভালো লাগে, তিনি তাঁকে জানতে চান, বুঝতে চান। প্রশ্ন করলেন, "কি করে ঈশ্বরকে জানা যায়?" মিস কলিন সেদিন আপ্লুত হয়েছিলেন মার্গারেটের প্রশ্ন শুনে। তিনি বললেন, "তাঁর সম্পর্কে জান, তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। তার মাধ্যমেই তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। ঈশ্বর তো স্বচ্ছ স্বয়ং প্রকাশ, অজানার অন্ধকার দূর হলেই, তাঁর প্রকাশ প্রত্যাক্ষ হয়। তোমার মধ্যে তাঁর লীলা মূর্ত হয়ে উঠুক।"

সেদিনের সেই শিক্ষিকার আন্তরিক অভিপ্রায় উত্তরকালে মার্গারেটের জীবনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এবং এই রকম গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই মার্গারেটের ব্যাক্তিত্বের বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব চেতনাও তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করে চলল। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করলেন, তাঁরও কিছু করার আছে, দেশকে কিছু দেওয়ার দায়িত্ব আছে। ইংরাজের অন্যায় শাসন-শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে, আইরিশ জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এইসব চিন্তার মধ্যে দিয়েই মার্গারেটের বিপ্লবী সত্তা জেগে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি জড়িয়ে পড়লেন আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের সাথে। উপলব্ধি করলেন দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষাই তৈরি করে জাতির মেরুদন্ড। ১৮৮৪ সালে সসম্মানে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, তিনি শিক্ষকতার জীবনই বেছে নিলেন। ১৮৮৬ সালে রেক্সহামে, ১৮৮৯ সালে চেস্টারে এবং ১৮৯০ সালে উইম্বলডনে পড়াবার পর, ১৮৯২ সালে উইম্বলডনেই 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুলে শুধু শিশুদেরই শিক্ষা দেওয়া হোত না, শিক্ষায় আগ্রহী বড়রাও পড়ার সুযোগ পেত।

কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও আধ্যাত্মিক ও বিপ্লবী চিন্তা তাঁর মধ্যে

নিরন্তর আত্ম-জিজ্ঞাসার আলোড়ন তুলেই চলল। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে জীবন চলতে লাগল। এই সময় গেলোয়াক নামে এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগেই গেলোয়াকের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এর পরে আর এক জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্ভবনা দেখা দেয়, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ধর্ম ও গতানুগতিক ব্যবস্থাসমূহের ব্যাপারে তাঁর মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। তিনি যুক্তিহীন কোনও কিছুই আর মেনে নিতে চান না। এই সময়ই তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী ক্রোপোটকিনের সঙ্গে। তাঁর প্রভাব মার্গারেটের চরিত্রকে (বিপ্লবী চেতনায়) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তা ছাড়া শিল্প শহরে বড় হয়ে ওঠার ফলে শিল্পের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই ছিল। এই আকর্ষণের পরিণতি হিসাবে তিনি হয়ে ছিলেন লন্ডনের ডোভার স্ট্রীটে অবস্থিত শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা কেন্দ্র 'সিসেম ক্লাবের' সদস্য ও পরের দিকে তিনি সেই ক্লাবের সম্পাদক হন। সেই সময় বার্ণাড শ, হ্যাক্সলি প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এছাড়া আয়ারল্যান্ডের সিন-ফিন বিপ্লবী সংগঠনের অনেক সদস্যের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল।

তারই মধ্যে ১৮৯৫ সালে তিনি অ্যাংলিকান চার্চের ফ্রি থিঙ্কার (Free Thinker) দলের সঙ্গে যুক্ত হন। আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে চলেছিল মার্গারেটের প্রতিভা। কিন্তু ক্ষেত্রের অভাবে বার বার প্রতিহত হচ্ছিল তাঁর উদ্যোগ। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। অসহিষ্ণুতা আর গোঁড়ামি পদে পদে। সেবাধর্মের এমন অন্তঃসারশূন্যতা দেখে তিনি পীড়িত হলেন। অন্যদের আত্মপ্রচারের হীন স্বার্থ, সেবাধর্মকে মর্মহীন ভন্ডামিতে পরিণত করছিল। এ কি করে তিনি মেনে নেবেন? মনের মধ্যে এই ভীষণ হাহাকার ও আর্তি নিয়ে পথ হাতরে চলেছেন তিনি। কোথায় পাবেন মুক্ত উদার বাধাবন্ধহীন পথ, যে পথ তাঁকে পৌঁছে দেবে পরম সত্যের কাছে?

এদিকে ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে সর্ব্বধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা ইউরোপ আলোড়িত হয়েছে হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জয়-জয়কারে। খবরের কাগজের পাতা জুড়ে কেবল তাঁরই খবর। ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে এসেছেন। মার্গারেট জানতে পারলেন ১৫ই নভেম্বর লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে সন্ধ্যে বেলায় একটি আলোচনা সভায় স্বামী বিবেকানন্দ আসছেন। শ্রোতা হিসাবে মার্গারেটও নিমন্ত্রণ পেলেন সে আলোচনা সভায়। মার্গারেটের অন্তর জুড়ে অতৃপ্তি আর মন জুড়ে আছে অন্বেষণ। কোথাও স্থির হতে পারছিলেন না। তাই তিনি সম্মত হয়ে সেই আলোচনা সভার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। এই আলোচনা সভাতেই তিনি প্রথম স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেন এবং স্বামীজির বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শোনেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মব্যাখ্যায় তিনি মুগ্ধ হলেন। এর পর লন্ডনে, স্বামীজির প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর সভায় উপস্থিত থাকেন। ১৫ই নভেম্বররের প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজির চিন্তাধারা তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। সেই দিনই যেন মুগ্ধ বিমোহিত মার্গারেটের প্রতিভা আত্মমুক্তির সন্ধান পেল। আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি। তারপর স্বামী বিবেকানন্দকেই নিজের গুরু বলে বরণ করে নেন এবং গ্রহণ করেন স্বামীজির শিষ্যত্ব।

পরবর্তী দুই বছর ধরে তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নেন, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। সেই সূত্রে ১৮৯৭ সালে স্বামীজির কাছে প্রস্তাব পাঠান যে তিনি ভারতবর্ষে এসে সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান। বিশেষত মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তাঁর এই প্রস্তাব স্বামীজি অনুমোদন করার পর মার্গারেট ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি পরিবার পরিজন ত্যাগ করে কোলকাতায় এসে পৌঁছান। স্বামীজির সান্নিধ্যে তিনি লাভ করলেন তাঁর আদর্শ কর্মক্ষেত্র। বিদেশিনী মার্গারেটকে সেবার অধিকার দিতে হলে, আগে তাঁকে অর্জন করতে হবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

তাই স্বামীজি মার্গারেটকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে ১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে এক সভার আয়োজন করলেন। স্বামীজিই ছিলেন সে সভার সভাপতি। স্বামীজির মানস-কন্যা এবং শিষ্যা মার্গারেটকে নিবেদন করলেন দেশের কাছে, দেশের সেবার জন্যে। করতালি মুখরিত সভায় অভিনন্দিত মার্গারেট হলেন অভিভূত। মার্গারেট তাঁর বক্তৃতায় বললেন, "পৃথিবীর মহত্তম আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে ভারতবর্ষের সঞ্চয়ে। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী এই সম্পদ ধারণ ও বহন করে আসছে। সেই মহান সম্পদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে, ভারতবর্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে আমি ভারতবর্ষে এসেছি। আমি সকলের সহানুভূতি ও সহায়তা কামনা করি।" স্বতঃস্ফুর্ত আগ্রহে করতালির মধ্যে মার্গারেটকে বরণ করে নিলেন ভারতবাসী। স্বামীজি মার্গারেটকে পরিচয় করিয়ে দেন, 'ইংল্যান্ডে আমার কর্মধারায় প্রস্ফুটিত সর্বোত্তম পুষ্প' বলে।

মার্গারেট হলেন ভারতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, "সিস্টার নিবেদিতা"। স্বামীজিই এই নামকরণ করেছিলেন। সেই দিন (১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ) থেকেই তিনি হন "ভগিনী নিবেদিতা"।

এর কয়েকদিন পর ১৭ই মার্চ (প্রথমবার) তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ২৫শে মার্চ স্বামীজির কাছে পেলেন ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা। এর পর ১৩ই নভেম্বর মায়ের উপস্থিতিতেই, ১৬ বোসপাড়া লেনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। সেই সময় স্কুলের নাম রাখা হয়েছিল 'রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস'। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে বিবেকানন্দের কাছে ভারতের দর্শন ইতিহাস, সাহিত্য, জনজীবন, সমাজতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মহাপুরুষদের জীবন কথা শুনে নিবেদিতা ভারতকে চিনতে শেখেন। সেই সময়ই কোলকাতায় ভীষণ প্লেগের মহামারী দেখা দেওয়ায় ঝাড়ুদাররা পর্যন্ত শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে রোগীর সেবায় লেগে গিয়েছিলেন, এমনকি রাস্তায় নেমে নিজে হাতে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা পরিস্কারের কাজে নেমে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় এই সেবা কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মঠের সন্ন্যাসীদের পুরোভাগে থেকে নিবেদিতা আর্তের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

নিবেদিতার করুণামাখা হাতের স্পর্শে দূর হোল প্লেগের আতঙ্ক। নিবেদিতার আসন প্রতিষ্ঠিত হোল দেশবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে।

স্কুল প্রতিষ্ঠার পর স্কুল চালানো খুব সহজ ছিল না। ছাত্রী এবং অর্থ জোগাড় করাটা বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। নারীশিক্ষায় অনাগ্রহী সমাজ থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটি একটি করে ছাত্রী সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই স্কুল পরিচালনার জন্যে তিনি বিদেশ থেকেও অর্থ জোগাড় করেন। তার জন্য অবশ্য তাঁকে ১৮৯৯ সালে বিদেশে যেতে হয়। ধীরে ধীরে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন স্বামীজি। মঠ-মিশনের কর্মসূচীর বাইরে ব্রাহ্মসমাজের সভাতেও তিনি যোগ দিতে লাগলেন। সপ্তাহে একদিন মহিলাদের সভায় বক্তৃতা দিতেন। এই সভায় উপস্থিত থাকতেন কেশব সেনের মেয়ে, ইন্দিরাদেবী (ঠাকুর-পরিবারের), সরলাদেবী, লাবণ্যপ্রভাদেবী প্রমুখ মহিলারা।

নিজের দেশে বৃটিশ শাসন-শোষণ ও অত্যাচারের সঙ্গে পরিচয় ছিল নিবেদিতার। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। নিবেদিতা অনুভব করলেন মা কালীর সাধনার মধ্যেই রয়েছে বৈপ্লবিক চেতনা। ভারতীয় আধাত্মিক সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করলেন Kali the Mother, The Story of Kali, The Vision of Shiva, The Voice of Mother ইত্যাদি। নিবেদিতার Kali the Mother বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিখ্যাত 'ভারতমাতা' ছবিটি আঁকেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর স্ত্রী অবলা বসু, যদুনাথ সরকার, নন্দলাল বসু, দিনেশচন্দ্র সেন, অসিত কুমার হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বেরা ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যা দেন।

এদিকে অবিশ্রান্ত কাজের চাপে স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি মহাসমাধি লাভ করলেন। একটা দুরন্ত ঝড়ে ভারত তথা সারা বিশ্বে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে চলে গেলেন এই বীর সন্ন্যাসী। নিবেদিতার মন্ত্রগুরু, আদর্শ-পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে হারিয়ে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সমস্ত কাজের নির্দেশ, উপদেশ যাঁর কাছ থেকে পেতেন, তিনি আজ অনুপস্থিত। আজ তাঁর কর্তব্য ও কর্মপন্থা কে নির্দেশ করবে? এখন থেকে তাঁর সাধনা হ'ল তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতবর্ষকে পুনর্গঠন করা। ভগিনী নিবেদিতার নতুন কর্মক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হোল ভারতীয় রাজনীতিতে।

উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রশ্নে ধীরে ধীরে মঠের সাথে সম্পর্ক শিথিল হয়ে এল। নিবেদিতার Kali the Mother পড়ে শ্রীঅরবিন্দ অনুপ্রাণিত হলেন এবং বাংলার মাটিতে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। মুক্তিকামী যুবকদের সংগঠিত করে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে দেশব্যাপী গড়ে তুললেন বিপ্লবী আন্দোলন। প্রত্যাক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিবেদিতাও জড়িয়ে পড়লেন এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। এই সময়ই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা স্থাপিত হয়। এবং তখনই, ব্রিটিশ সরকার যাতে রামকৃষ্ণ মিশনকে অযথা উত্ত্যক্ত না করে, সেই কথা ভেবে মিশনের সঙ্গে তিনি তাঁর 'আনুষ্ঠানিক' সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তা সত্বেও মৃত্যুর ঠিক ৬ দিন আগে (৭ই অক্টোবর ১৯১১) তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি একটি উইলের মাধ্যমে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের নামে সমর্পন করে যান।

রাজনীতির কারনে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করলেও, আজীবন নিজের পরিচয় দিয়েছেন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা" বলে। নিপীড়িত ও দরিদ্রের জাগরন ঘটাবার জন্যে স্বামীজির আহ্বানই তাঁকে রাজনীতির জগতে টেনে এনে ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোনও জাতির পক্ষে কিছুতেই আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উদাত্তকন্ঠে আহ্বান জানান বিলেতী দ্রব্য বর্জনের। তাঁর স্বপ্ন ছিল অখন্ড সুখী বিবেক-পরিচালিত ভারতবর্ষ। তিনি বিশ্বাস করতেন এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশকেন্দ্র ভারতবর্ষ। তাই ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিই ছিল তাঁর চরম লক্ষ্য।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কোলকাতার টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় তাঁর বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। পরের বছর পূর্ব বাংলার বন্যা ও দুঃর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সেবা করতে গিয়ে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে উড়িষ্যায় যান দুঃর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার জন্যে। সেখানেও আক্রান্ত হন সেরিব্রাল ফিবারে।

১৯১০ সালে স্বামীজির জন্মদিনে প্রকাশিত হয় নিবেদিতার বিখ্যাত বই "The Master I saw Him"। এরই কয়েকদিন পরে, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে চলে গেলে, নিবেদিতা অরবিন্দ পরিচালিত 'কর্মযোগিন' পত্রিকার ভার নিজ হাতে তুলে নেন। চন্দননগর থেকে পন্ডিচেরীতে চলে যেতে নিবেদিতাই শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে সাহায্য করেন।

১৯০২ সাল থেকে ১৯১১ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক রক্তলিপ্ত অধ্যায়। উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ। ইংরাজ শাসনকে উচ্ছেদের জন্যে প্রাণবলি দিতে লাগলেন বিপ্লবী তরুণের দল। কেঁপে উঠল বৃটিশ সিংহাসন। দমন-পীড়ন যত বাড়তে লাগল, পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল বিপ্লবীদের আক্রমণ ও আত্মদানের পালা। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিবেদিতার শরীর ভেঙ্গে যায়। স্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি জগদীশ চন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিঙে যান। সেখানেই তিনি ৭ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশনের নামে তাঁর সমস্ত সম্পতির উইল করেন। এখানে তিনি অসুস্থ হয়েই এসেছিলেন। একদিন অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। আক্রান্ত হলেন আমাশয়ে। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে, মাত্র ৪৪ বছর বয়সে, ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তাঁর সাধনোচিত ধামে গমন করলেন।

ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ মার্গারেটের নাম স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন 'নিবেদিতা', রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'লোকমাতা' বলে, জগদীশচন্দ্র নাম দিয়েছিলেন 'শিখাময়ী'। কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণে তিনি বিবেকানন্দের নিবেদিতা– 'সিস্টার নিবেদিতা', 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা', হয়েই বিরাজ করবেন চিরকাল।

Sister Nivedita, Mrs. Sevier, Sister Christine and Smt. Abala Basu

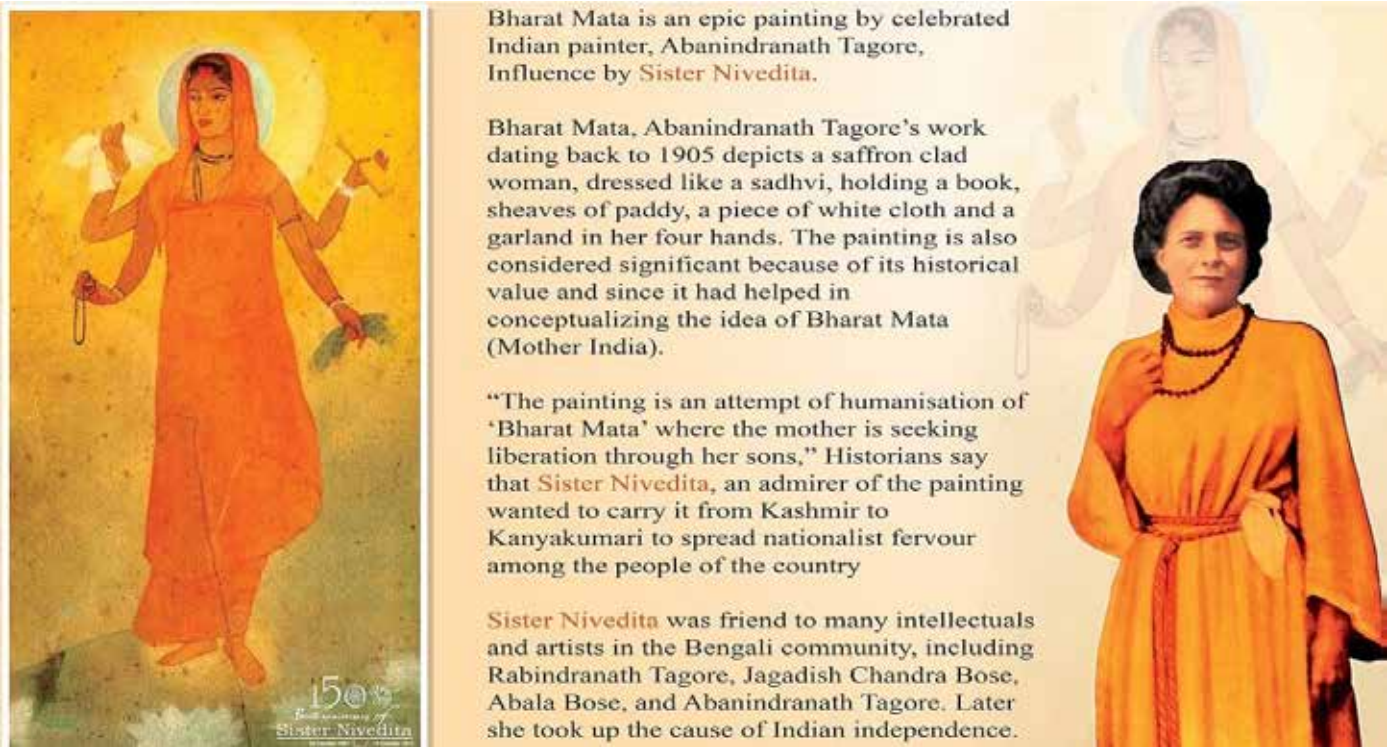

Durga pujo to durgotsav: a journey.

- Poulamee Guha

The biggest annual religious festival for the Bengalis, Durga Puja, as we all know celebrates the victory of the Hindu goddess Durga over the evil demon Mahishasura. The occassion is also known by various names such as Durgotsab ('Festival of Durga') and Sharodotsab ('Autumn festival').

How did it come to become one of the most awaited occasion in our lives? Lets take a look at its journey through the pages of history.

Durga Puja is celebrated every year in the Hindu month of Ashwin (September-October) and commemorates Prince Rama's invocation of the goddess before going to war with the demon king Ravana. This autumnal ritual is different from the conventional Durga Puja, which is usually celebrated in the springtime. So, this Puja is also known as 'akal-bodhan' or out-of-season ('akal') worship ('bodhan').

The first Durga Puja in Bengal

The first grand worship of Goddess Durga in recorded history is said to have been celebrated in the late 1500s. Folklores say the landlords, or *zamindar,* of Dinajpur and Malda districts initiated the first Durga Puja in Bengal. According to another source, Raja Kangshanarayan of Taherpur or Bhabananda Mazumdar of Nadiya organized the first *Sharadiya* or Autumn Durga Puja in Bengal in the year 1606.

The origin of the community puja can be credited to the twelve friends of Guptipara in Hoogly, West Bengal, who collaborated and collected contributions from local resi dents to conduct the first community puja called the 'baro -yaari' puja, or the 'twelve-pal' puja, in 1790. The baro-yaari puja was brought to Kolkata in 1832 by Raja Harinath of Cossimbazar, who performed the Durga Puja at his ancestral home in Murshidabad from 1824 to 1831 High level British officials regularly attended Durga Pujas organized by influential Bengalis. East India Company itself in 1765 it offered a thanksgiving Puja, no doubt as a politic act to appease its Hindu subjects, on obtaining the Diwani of Bengal. It is reported that even the Company auditor-general John Chips organized Durga Puja at his Birbhum office. In fact, the full official participation of the British in the Durga Puja continued till 1840, when a law was promulgated by the government banning such participation."

The "Sharadiya" Durga Puja in Calcutta(Kolkata) is said to have first started in the year 1757 with the Durga Puja of Sovabazar Rajbari. The oldest puja in Kolkata, it came to being due to the efforts of Maharaja Naba Krishna De, the founder of the Shobhabazar royal family.

The Battle of Plassey was a landmark in the history of British domination in India as the victory of the British forces in this war gave the East India Company control of Bengal. Robert Clive was the then chief officer of British East India Company. Nabakrishna Deb invited Clive to his house at Durga Puja. Initially Clive had some hesitations to attend the puja as in those days Christians were not allowed by the Hindus to take part in Hindu festivities but Robert Clive paid a visit to the Shobhabazar Rajbari to offer his thanks to Goddess Durga. Thereafter, the *Shobhabazar Durgotsab* (Durga Puja ceremony) came to be known as the "Company Puja".

but Robert Clive paid a visit to the Shobhabazar Rajbari to offer his thanks to Goddess Durga. Thereafter, the *Shobhabazar Durgotsab* (Durga Puja ceremony) came to be known as the "CompanyPuja".

The Shobhabazar Sharodotsab proved a trendsetter in Durga Puja festivities of Bengal. From this time until the independence of India in 1947, inviting Englishmen to Durga Puja ceremonies became a fashion. The number of Englishmen attending the family Durga Puja became an index of prestige and a status symbol among the upcoming merchant class of Kolkata. After this trendsetting puja of 1757, many British Officers of the East India Company were invited as guests of honour in the Pujas by various wealthy mercantile and Zamindar families in Bengal. The hosts vied with one another in arranging the most sumptuous feasts and organizing lavish decorations and entertainment for their white guests. This was a way of pleasing officials of The East India Company which was in charge of a large part of India including Bengal.

Traditional clay image of Durga , or *pratima,* made of clay with all five gods and goddesses under one structure is known as 'ek-chala' ('ek' = one, 'chala' = cover). There are two kinds of embellishments that are used on clay-- *sholar saaj* and *daker saaj*. In the former, the *pratima* is traditionally decorated with the white core of the *shola* reed which grows within marshlands. As the devotees grew wealthier, beaten silver (*rangta*) was used. The silver used to be imported from Germany and was delivered by post (*dak*). Hence the name *daker saaj*.

The ‘baroyari’ puja gave way to the *sarbajanin* or community puja in 1910, when the Sanatan Dharmotsahini Sabha organized the first truly community puja in Baghbazar in Kolkata with full public contribution, public control and public participation. With time, the "barowari" (community) pujas took over in a big way. The coming of corporate sponsorship helped these public puja ceremonies far surpass the grandeur of the private pujas.

Journey of Durga puja in global-scape:

The first Durga puja abroad was held in London in early 1960s. Today, it is held in all the five continents, from South Africa to Australia and New Zealand, to Latin America, North America, and Europe as well as West Asia, Southeast Asia, Japan, as also China. Even in former socialist countries like Russia Durga puja is held since 1969.

In Northern Europe where few Indians live, the Durga puja is observed in the Netherlands, Denmark, Norway, Sweden, and Finland and even in Greenland. It is held almost in all countries in Central and south Europe, and in the United Kingdom – England, Wales, Scotland and Ireland. In London, it is a big festival.

In West Asia the puja is held in Abu Dhabi since 1985, and it soon followed in Kuwait, Bahrain, Oman, and in Egypt. In Southeast Asia, Philippines, Indonesia, Singapore, and Fiji are the main countries where the puja is celebrated. Even in Africa, Durga puja is celebrated in South Africa, Kenya and Tanzania; in West Indies – Dominican Republic, Guiana, Trinidad, and in South America, it was celebrated for the first time in Brazil in 2011 and in Mexico 2012.

মহানগরী তোমায়

স্বয়ম সরকার

প্রিয় কলকাতা,
আশা করি ভাল আছো। বন্ধ, মিছিল এগুলো তো তোমার রোজকার সমস্যা, তাই আর এগুলো নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। আজ প্রায় তিন বছর হল তোমাকে ছেড়ে বিদেশে পারি দিয়েছি। খুবই আলাদা দুটো দেশ, কিন্তু কি বলো তো তোমাকে খুব মিস করি। মাত্র ১৮ বছর কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলাম তোমার কাছে। তোমার অলিগলি পুরো চিনে ওঠার আগেই তোমাকে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। তোমার সাথে কত স্মৃতি জড়িয়ে। মনে আছে tuition কাট করে তার সাথে ঘুরতে যাওয়া, হাত খরচা জমিয়ে তার জন্য উপহার কেনা, এমন কি প্রথম Break-Up এর চোখ এর জল এর গল্পও তোমার জানা। কলেজ শেষ হবার পর বউদির দোকান এর চা আর বাপুজি কেক আজও মিস করি।

মহালয়া আগের দিন রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাতে সকালে উঠে রেডিও তে মহালয়া শোনা যায়, তারপর টেলিভিশন এর পর্দায় মহিষাসুর মর্দিনী – এই ছোট ছোট জিনিস গুলো বড্ড মিস করি। এখন আর কই সেই পুজোর আমেজ, বাবার সাথে নতুন জামা কিনতে যাবার উৎসাহ। আগে পঞ্চমী থেকে বই খাতা তুলে রাখা, তার আগে থেকে পুজোর প্ল্যান, কোন দিন কথায় কার সাথে যাব। বাবা কাকুর থেকে পুজোর হাত খরচা, সব মিলিয়ে পুরো 5 দিন এর সমস্ত প্ল্যান রেডি। দশমীর পর বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিষ্টি খাওয়া – সেসবের আলাদাই মজা ছিল। জানি না বড় হবার জন্যই কি এই ইচ্ছা ধীরে ধীরে কমে যাছে, নাকি তোমার আমার এই দূরত্বের জন্য? এখানে থেকে অনেক শিখেছি অনেক দেখেছি, কিন্তু কেন জানি না আজও কলকাতার অলিতে-গলিতে মন টা ঘুরে বেড়াতে চায়, হারিয়ে যেতে চায়।

জানো তো কিছু জিনিস খুব দেরি করে আসে আর আসলে তা নিমেষে শেষ হয়ে যায়। আমার এবার তোমার কাছে যাওয়া তাও ঠিক তেমন ছিল। বন্ধুদের সাথে ২ বছর পর দেখা, সবারই সেই একই পরিচিত সত্ত্বা। ঠিক যেখানে ছেড়ে গেছিলাম সেরকমই আছে সব। দুবছরের এই বিরাট দূরত্ব যেন নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেল। আমরা সবাই যেন সেই আগের মত মিশে গেলাম, ঠিক যেমনটা ছিলাম স্কুলের সময়। এক সাথে থাকা, গালাগালি, মারামারি, রাত জেগে আড্ডা, ছাদে ক্রিকেট খেলা – সবই যেন উপভোগ করতাম। কিন্তু জানো ফেরার সময় মন চাইছিল না তমায় ছেড়ে আবার চলে আসতে, এই বন্ধুদের ছেড়ে চলে আসতে, কিন্তু সেটা কী আর সম্ভব বলো? পরিযায়ী পাখি দের তো ঘর ছাড়তেই হয়।
আবার না হয় ফিরবো কোনো একদিন তোমার কাছে, ততদিন সব আগের মত রেখো।

ইতি

তোমার পরিযায়ী পাখি

Realization of life as it unfolds

- Pavitra Roy

During winter over the weekends I used to notice some of our servants in their servant quarter would light small fire. They did this in order to fight cold and to feel warmth in a chilly winter with their respective families and enjoy tea and breakfast in early morning. The whole process used to start nearly one and half-hour before. The entire family participated in this. It would be smoke first, then fire and then breakfast. After breakfast basking would continue as their family enjoy warmth from the half lit fire and the Sun.

I wanted to feel the fire and smoke from leaf as well. But I was not allowed to leave our study room. I along with my brother, we will read our lessons aloud. If we stop, our parents will immediately find out that we have stopped reading and engaged ourselves something really entertaining. So we had to wait till our study time is over. Other than that only when our father was away for an official tour, we had rare chance to enjoy the charm of warming our self with bare hand in the specially created fire by our servant. Other wise most of the time we were late, when we would reach the spot. The fire would have extinguished and everyone would have gone.

We grew up .We were now allowed to light fire on Holi with our community friends. But this event cannot be compared to the special fire that was created for warming children with lesser warm clothes during winter by our servants.

Also later on, during Makar Sankrant and Lohri we would make ring of fire. We sang and danced with friends and families in the community. We would be wearing warm cloths because in the month of January our country India is very cold. When I compared these events with breakfast fire made by our servants with very little warm cloth for children. I missed that feeling of warmth. I can still imagine the chill wind, less bright, weak Sunrays. Children are running are bringing dry leafs to keep the fire going. Tea, corn, green peas sweet potato are grilled or prepared.

Almost three decades have past. I live in a different country now. I have forgotten about my school days. I have grown up children who are school going. It was one of the winter mornings that resembled weekends during our schooldays. It was very cold and a windy. Chill would remind me exactly what I used to enjoy looking out of my windows towards our servant quarters. Suddenly an ambient smoky smell in the neighborhoods made me feel excited and nostalgic. I asked my children to go and collect some dry leaf and wood. They were very surprised. They asked what am I supposed to do with that. I said to them we would make a fire and feel the warmth in our bare hand. Children looked at me amused. Room heaters are giving enough warmth already. Children asked me, why we do have to go and light fire out side. What if our neighbor objects? I looked at them and smiled. I was about to tell them the story of my childhood. Then I fell short of words to explain my feeling. How precious were those moments. How I used to manage few minutes from my study to sneak out and feel the heat from burning of wood and dry leafs. Some times I would be trying to burn fire for some more time without success. The smoke would cause me sore eyes and no fire will ever be seen. Yet I would blow with a folded notebook or a magazine at my best to lit up the fire with or without much success

I stopped imagining. No more reasoning, stories or explanation to anyone. I decided to buy some firewood and light them in my fireplace instead. After all we have to be rational. I need to change according to circumstances. I bought a lighter, some paraffin and wood stock. Had done a professional clean up of the fireplace. It did not take much time to fire paraffin and then some paper and leafs. The dry wood will burn creating heat as long as we wanted. Whole process was less than 10 minutes. I closed my eyes and tried my best recreate same feeling. Nah! It was not even 1/100th of the warmth I used to enjoy besides the fun and excitement in my childhood.

Now I started to analyze. Why am I not able to bring back the same feeling in me in my mind or in my body? What is missing here? I have to suggest my deepest emotion to surface out and give me back my feelings for little longer, I could easily afford now.

Then I realized, it is not the experience itself, which gives us full contentment. It is the experience of unfulfilled desire that makes us revisits experience till we are fully contented. Some time our children will stop us from fulfilling our wild or insignificant dreams. Nevertheless they are very personal and special. They remain deep within. I realized my life bit better as I listened to following gazal sung by late Jagjit Singh & Chitra Singh in the "Aaj "

" Ye daulat bhi lelo, ye sohrat bhi le lo
Bhale cheen lo muhjse Meri jawaani
Magar mujhko lauta do bachchpan ka saawan
Woh kagaz ki kasti woh barish ka pani "

…Yes…. that explains it better.

ভিক্টোরিয়া ফলস

"রোডেশিয়া" থেকে "জাম্বিয়া"

প্রীতিকণা মিত্র

লিবিয়া থেকে ফিরে আড়াইমাসের কিশোরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কোথা দিয়ে প্রায় এক বছর কেটে গেছে টেরও পাইনি। এরই মধ্যে কিশোরের বাবা আমাদের দেশে রেখে ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এলেন একটা মেডিক্যাল কোর্স করে। সেখান থেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন জাম্বিয়ার চাকরির পরোয়ানা। নতুন দেশ দেখার আগ্রহ আমার ছোটবেলার থেকে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ খবর শুনে খুবই উচ্ছসিত হলাম। আমাদের টিকিটের ব্যবস্থা করে তিনি চলে গেলেন লুসাকা (জাম্বিয়ার রাজধানী) চাকরিতে যোগ দিতে। কিছুদিন পরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমি এক বছর চার মাসের কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে বোম্বে থেকে রওনা হলাম লুসাকার উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছুতেই আমাদের ওঠানো হলো এক পাঁচতারা হোটেলে। আমি অবাক হলাম। হোটেলে কেন? জানতে পারলাম সরকার কিশোরের বাবাকে যে পদে নিযুক্ত করে এখানে নিয়ে এসেছে সেই পদ খালি নেই বলে তাকে তার নিচের পদে যোগ দিতে বলাতে তিনি রাজি হন নি। তাতে তাঁরা তাঁকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন এবং এই হোটেলেই বিনা খরচায় তাঁর এবং তাঁর পরিবারের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের এখন না ডাকলেই হতো। তাতে উনি বললেন, যদি কোনো কারণে দেশে ফেরত চলে যেতে হয়, তবে এখানকার সরকারের খরচে এ দেশ দেখার সুযোগের থেকে আমরাই বা বঞ্চিত হই কেন? তাই আমাদের নিয়ে এসেছেন। দেশে সকলে চিন্তা করবে বলে সেখানে সকলকে এসব কিছুই জানানো হয়নি।

যা হোক একমাস পরেই কিন্তু হোটেলের রাজশিক খাওয়া দাওয়া ও সুখ দায়ক ব্যবস্থা কেমন ফিকে লাগতে লাগলো। একটু ডাল ভাত মাছের ঝোলের জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ঠিক সাড়ে চার মাস হোটেলের সুখ ভোগের পর উনি পূর্ব নির্ধারিত পদে নিযুক্ত হলেন এবং তাঁর পোস্টিং হলো জাম্বিয়ার দ্বিতীয় শহর "কিটোয়ে"।

আফ্রিকার "নিগ্রো" বলতে আমরা যা বুঝি, জাম্বিয়ার বাসিন্দারা ঠিক তাই। কালো ঘন কোঁকড়ানো ছোট ছোট চুল, থেবড়া নাক, পুরু ঠোঁট ও নিকষ কালো রং। ২০০০ বছর আগে "বানটু" উপজাতি আশপাশের দেশ থেকে এই ভূমিখন্ডে এসে বসবাস করতে শুরু করে। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও এর নাম জাম্বিয়া হয়নি। আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্তে সাউথ আফ্রিকা, তার ঠিক উপরে ব্রিটিশ অধিকৃত বিশাল এই ভূমিখণ্ড "রোডেশিয়া" নামে পরিচিত ছিল। এক কালে একটা প্রবাদ ছিল - "ব্রিটিশ সূর্য কখনো অস্ত যায় না"। আফ্রিকার দেশগুলি তার নিদর্শন।পৃথিবী জুড়ে প্রতিবাদের যে ঢেউ উঠেছিল তাতে তাদের সূর্য অস্ত গেছে প্রকৃতির নিয়মে। ব্রিটিশরা এই রোডেশিয়াও ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তারা তাদের সুবিধার্থে এই দেশকে দুই ভাগ করেছিল। উত্তর রোডেশিয়া ও দক্ষিন রোডেশিয়া। ১৯৬৪ সালের ২৪ অক্টোবর উত্তর ভাগের স্বাধীনতার পর নাম হয় "রিপাব্লিক অফ জাম্বিয়া"। দক্ষিণ ভাগের নাম হয় "জিম্বাবোয়ে"। এ দেশ স্বাধীনতা পায় আরও পরে ১৯৭৯ সালে। "জিম্বাবোয়ে"।

স্বাধীন জাম্বিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউন্ডা (Kenneth Kaunda), আমরা ওখানে থাকতে তাকেই পেয়েছি। ১৯৯০ সালের কাছাকাছি এঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলে উনি ক্ষমতাচ্যুত হন। তার বদলে রাষ্ট্রপতি হলেন লেভি-মোয়ানাওয়াসা (Levi-Mwanawasa)।

জাম্বিয়ার প্রধান নদী "জাম্বেজি"। এরই নামানুসারে এদেশের নাম হয় জাম্বিয়া। এই নদী জাম্বিয়াকে জিম্বাবোয়ের থেকে আলাদা করে রেখেছে এবং পাশের দেশ মোজাম্বিক হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়েছে। জাম্বিয়ার উত্তরে কঙ্গো, জাইর ও তানজানিয়া। পূর্বে মোজাম্বিক ও মালাউই। পশ্চিমে এংগোলা ও নামিবিয়া এবং দক্ষিণে বটসওয়ানা ও জিম্বাবোয়ে।
এদেশের ৯০ শতাংশ লোক খ্রিষ্টান। জাতীয় ভাষা ইংরেজি। স্থানীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো "বেম্বা", "নিয়ান্দা", "টোঙ্গা" প্রভৃতি। প্রধান আয়ের পথ তামার খনি। বিভিন্ন জায়গায় কপার বেল্ট থেকে তামা রপ্তানি করে যে আয় হয় তাতে দেশের সব প্রয়োজন মেটে না। ফলে সাধারণ লোক বেশ গরিব। দেশজুড়ে চুরি চামারির প্রকোপ খুব বেশী। আমাদের কোয়ার্টারেই চুরি হয়েছে বেশ কয়েকবার।একদিন প্রচুর টাকা সঙ্গে নিয়ে কিশোরের বাবা গাড়িতে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বন্দুক দেখিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়িটাও নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু উনি বুদ্ধি করে সেটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই ধরণের চুরি

ডাকাতি সাধারণত ইংরেজদের বাড়িতে হয়. এমন ইংরেজ যারা তখনও ওদের দেশে ওদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসবাস করছে। স্থানীয় লোকেদের বাড়িতে বোরো একটা হতো না।

আমাদের আস্তানাটা ছিল ইংরেজদের তৈরী বাংলো বাড়ি। সঙ্গে বিশাল বাগান ও সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স। সেখানে থাকতো এক স্থানীয় পরিবার। "এঙ্গা এঙ্গা" ও "ক্রিস্টিনা"। লোকটি (এঙ্গা এঙ্গা) বাগানে কাজ করতো আর বাড়ি দেখাশোনা করতো আর মহিলা (ক্রিস্টিনা) ঘরের ভেতরকার সব কাজ করতো। ওদের তিনটি ছেলে। বড়োটি "আলবার্ট", দ্বিতীয়টি "কেফা" ও ছোট্টটি "ব্রাইটন"। ছোটটি আমার ছেলের বয়সী, এমনকি ওদের জন্মদিনও এক। ওরা দুজনে খুব বন্ধু ছিল। সুতরাং কিশোরের জন্মদিনে ব্রাইটনেরও নতুন জামাকাপড় আর বার্থডে কেক পাওনা হতো।

ওদের প্রধান খাদ্য ছিল মিলিমিলি (ভুট্টার আটার মণ্ড), সঙ্গে কুমড়ো পাতা বা জবার পাতা সেদ্ধ। বিশেষ দিনে মুরগি কিংবা শুওপোকা বা উইপোকা ভাজা। মাঝে মাঝে ওদের ঘর থেকে চিংড়িমাছ ভাজার গন্ধ পেলেই আমার তিন বছরের ছেলেকে বাড়িতে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। বুঝতাম যে আজ তার লাঞ্চে শুঁয়োপোকা ভাজা খাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে। সেটা অবশ্য আমার কাছ থেকে লুকিয়েই। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে অজস্র উইপোকার দল (ইন্সোয়া) উড়ে বেড়াতে দেখা গেলো। ব্রাইটনের পরিবারের সদস্যরা উচ্ছাসিত হয়ে কৌটো নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে দেখলাম সেই উইপোকা ধরতে। এমন সুযোগ নাকি খুব কমই আসে, জানালো ক্রিস্টিনা। তাদের সঙ্গে আমার ছেলেও দেখলাম ভীষণ ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে উইপোকা ধরে ব্রাইটনকে সাহায্য করতে। তার কাছে সে এক মজার খেলা।

এখানে আবার শুঁয়োপোকার চাষও হয় আর বাজারে বস্তা বস্তা শুকনো শুঁয়োপোকা বিক্রি হয়। কিশোরের বাবার কাছে শুনেছি যে হাসপাতালে নার্সদের পকেটে নাকি ওই শুকনো শুঁয়োপোকা সবসময়েই থাকে। থেকে থেকেই তারা চিনে বাদামের মতো সেগুলো টপাটপ মুখে পুরে দেয়। নানা পশুপাখির শুকনো মাংসও এদের কাছে অতি উপাদেয় খাদ্য। যেমন চড়ুই, বাদুড়, গুঁইসাপ, বাদর, সাপ ইত্যাদি।

এখানকার মাটি খুব উর্বর। চারিদিকে খালি মাঠ আর সবুজের মেলা। প্রধান ফসল ভুট্টা। বেশিরভাগ লোকই নিজের বাড়িতে তার নিজের পরিবারের খাওয়ার মতো ভুট্টা তৈরী করে নেয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। সারা বছরই না গরম না ঠান্ডা, খুব আরামদায়ক আবহাওয়া।

কিছুদিন পর আমার শাশুড়িমা এলেন জাম্বিয়ায় আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে। এটাই ওনার প্রথম বিদেশে আসা। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গেলাম। যেমন "মুফুলিরা", "এন্ডোলা", "কাফুয়ে"। আমরা ও আর একটি বাঙালি পরিবার গেলাম লিভিংস্টোন, ভিক্টরিয়া ফলস দেখতে।

ব্রিটেনের "ডেভিড লিভিংস্টোন" ১৮৫৫ সালে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত। তখনকার বেশিরভাগ ব্রিটিশ আবিষ্কারের মতোই তিনিও সেটার নামকরণ রানী ভিক্টোরিয়ার নামেই করেন। লিভিংস্টোন সাহেব এখানেই বসতি স্থাপন করেন ও তার নামানুসারে এই জায়গার নাম হয় "লিভিংস্টোন"।
জাম্বেজি নদী বয়ে যেতে যেতে হটাৎ ১.৬ কিলোমিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। নদীর জল নিচে "কারিবা" হ্রদে পড়ে। এই জল পড়ার সময়ে যা আওয়াজ হয় তাতে আর অন্য কিছু শোনা যায় না এবং জলোচ্ছাসের জলকণা চারিদিকে ছিটিয়ে এক ধোঁয়াধার সৃষ্টি হয়। তাতে সূর্যের আলো পড়ে সর্বক্ষন একটা বিশাল রামধনু হয়ে থাকে। এই অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মনে হয়েছিল "এটাই কি স্বর্গ?"।

এখানে এসে আর একটি মনে থাকার মতো অভিজ্ঞতা হলো। আমরা উঠেছিলাম একটি নামকরা হোটেলে। ইচ্ছা ছিল সেখান থেকে বর্ডার পেরিয়ে জিম্বাবোয়ে বেড়িয়ে আসব। কিন্তু প্রথম রাতে ভোর হতে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি আমাদের ঘরের সব চুরি গেছে। আমার হাত ব্যাগে কিছু গয়না ও কিছু টাকা (৫০০ কোয়াচা /৫০০০ টাকা) ছিল, এ ছাড়া কাপড় চোপড়, সকলের পাসপোর্ট, গাড়ির লাইসেন্স, সবকিছু। পুলিশে খবর দেওয়া হতে তারা খুঁজে পেতে গাড়ির লাইসেন্সটা খাদের কিনারা থেকে উদ্ধার করলো। কিন্তু পাসপোর্ট ও অন্যান্য আর কিছুই পাওয়া গেলো না। সুতরাং আমাদের জিম্বাবোয়ে যাওয়া স্থগিত রইলো, যদিও কিশোরের বাবা এই কাজটা আগেই সেরে রেখেছিলেন। তার বদলে আমরা গেলাম লঞ্চে করে জাম্বেজি নদীতে জলবিহারে। হিপ্পোপটেমাস (জলহস্তী) আর কুমিরেরা মনের আনন্দে দল বেঁধে জলে খেলা করছে। সাবধানে তাদের পাশ কাটিয়ে লঞ্চ এগোচ্ছিল ধীরে ধীরে। জলপ্রপাতের কাছাকাছি যেখানে নদী নিচে পড়ছে, সেখানে একটা সীমার ওপারে লঞ্চ যাওয়া নিষেধ। সুতরাং সেখান থেকে আমাদের ফিরতে হলো।

সত্যিকারের আফ্রিকার জঙ্গল বলতে যা বোঝায় আমরা তা দেখলাম এখানে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে বুনো হাতির দল ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে লোকালয়ে। জিরাফ, হরিণ, জেবরা, সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমন দূরদর্শনে দেখতে পাই। বিষাক্ত এবং বিশাল সব সাপ জলে ও স্থলে দু জায়গাতেই দেখা যায়। "স্পিটটিং কোবরা" তো আমাদের বাংলোর বাগানেই দেখেছি। যা হোক এসব দেখেই জিম্বাবোয়ে না দেখতে পারার দুঃখ কিছুটা ভোলা গেলো।

ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি জানা থাকলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায় সর্বত্র। কয়েকমাস একটা স্কুলে কাজ করেছিলাম। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জীবন বিজ্ঞান পড়াতাম। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় পর্বের পর নাম ডাকা খাতা নিয়ে নাম ডাকতে গিয়ে তিনটে উত্তর পেলাম। "প্রেজেন্ট", "আবসেন্ট" এবং কিছু অনুপস্থিত ছাত্রীদের বেলায় অন্যেরা নির্দ্বিধায় বলছে "পি"! জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলাম যে "পি" হলো "প্রেগন্যান্ট"। সেইজন্য তারা ছুটিতে সুতরাং তাদের নামের পাশে আমাকে "পি" লিখতে হলো। এটাই নাকি এখানকার নিয়ম। মাত্র ক্লাস এইট এ এতগুলি অল্পবয়েসি অবিবাহিতা মেয়ে গর্ভবতী! এ কি করে সম্ভব? পরে জানতে পারলাম যে যৌনতা এরা এখানে অবাধে ভোগ করে ছোটবেলা থেকেই। কোনো বিধি নিষেধের বেড়াজাল নেই। তার উপর শিক্ষার অভাব। সাহেবরা এ দেশটাকে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছে কিন্তু এদের চাকর বানিয়ে রেখেছিলো। শিক্ষিত করতে পারে নি কিংবা চায়নি। সুতরাং "এইডস" এখানে মহামারী রূপে দেখা দেয়। ২০০৪ সালে এদেশে মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার মধ্যেও এক লক্ষ্য লোক এই রোগে মারা যায়।

জাম্বিয়ায় প্রচুর ভারতীয়। বিশেষ করে রাজস্থানি, গুজরাটি ব্যাবসায়ীরা কয়েক পুরুষ ধরে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে এখন নাগরিকত্ব ভোগ করছে। প্রচুর বাঙালিও আছে। লুসাকায় আমাদের সময়ে ৮০ ঘর বাঙালি ছিল, কিটোয়েতে ২৫ ঘর। বাঙালিদের মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেয়ে ও খাইয়ে বেশ ভালোই কেটেছে। ভালো মিষ্টি তৈরী করতে শিখেছিলাম। বাঙালি মেয়েরা এখানে ছিল এক একজন দক্ষ ময়রা। আমার ছেলের চার বছরের জন্মদিনে আমি নিজের হাথে ৪০০ প্রমান আকারের সন্দেশ ও ৩০০ রসগোল্লা তৈরী করেছিলাম। খাবার জিনিসের দাম তুলনামূলক ভাবে কম ছিল।

আমার শাশুড়িমা জাম্বিয়ায় আসার পর উনি, ওঁর ছেলে (সঙ্গে আমার ছেলেও) মিলে দেখবার মতন বাগান করেছিলেন। সেখানে এমন কোনো সবজি নেই যা ছিল না। সঙ্গে রকমারি ফুল। এখানে প্রচুর আম পাওয়া যেত। আর ফলের মধ্যে বিশেষ করে ছিল আভোকাডো, স্ট্রবেরি, মালবেরি, প্রভৃতি। বাড়ির বেড়ার ধার দিয়ে ঝিঙে তৈরী করেছিলেন যা খেয়ে এবং বিলিয়েও শেষ করতে পারিনি। কিশোরের বাবা এক জাম্বিয়ান নার্সের বাগানে এক বিশাল কাঁঠাল গাছ আবিষ্কার করেন যাতে ভর্তি কাঁঠাল হয়ে ছিল। এরা এই ফল খেতে না জানায় গোরুদেরই দেওয়া হতো। এই আবিষ্কারের পর থেকে কিটোয়ের বাঙালিদের আর এঁচোড় ও পাকা কাঁঠালের অভাব হয়নি।

আমার ছেলে তার ঠাকুরমাকে পেয়ে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে আমরা সেখানে আরেকটি সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করেছি। ইস্কনের মন্দির। সেখানকার "একেন্দ্রদাস" ও "ব্রজলীলা"কে দেখে কে বলবে এঁরা আমাদের দেশের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী নন কিন্তু উত্তর আমেরিকার মানুষ। একেন্দ্রদাস একজন "আফ্রিকান আমেরিকান" ইঞ্জিনিয়ার, লম্বা সুন্দর চেহারা। তিলক কেটে ধুতি পরে, গলায় কন্ঠী ও মাথায় টিকি ঝুলিয়ে যখন খোল বাজিয়ে রোজ সন্ধ্যাবেলায় কীর্তন করতেন, বোঝা মুশকিল হোত যে আমরা দেশের কোনো মঠে বসে নেই।

তার সঙ্গিনী এক ব্রাজিলিয়ান গবেষিকা। "ব্রাজিলিয়া" নাম পাল্টে হয়েছেন "ব্রজলীলা"। শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে, গলায় কন্ঠী, তিলক কেটে, হাথে শাখা পলা, লোহা পরে যখন করতাল বাজিয়ে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম নিতেন তখন মনে হোত যেন কোনো বাঙালি ঘরের বধূ। খাওয়া দাওয়াও সম্পূর্ণ নিরামিষ। এখানকার বাসিন্দা বা সাহেবদের পক্ষে এটা বেশ কঠিন। তাদের সঙ্গে খুব কাছ থেকে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি। তাদের সুখ দুঃখও ঠিক যেন কোনো বাঙালি ঘরের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের বাড়িতেও তারা এসেছেন কীর্তন করতে কিছু স্থানীয় জাম্বিয়ান কীর্তনীয়াদের নিয়ে।

এখানে আমাদের আরো একটি সময় কাটানোর সাধন ছিল। যে সব সাহেবরা ধীরে ধীরে তাদের দেশে ফিরে যাচ্ছিলো, যাওয়ার আগে তারা তাদের বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র নিলামে বিক্রি করে দিয়ে যেত। প্রত্যেক রবিবার কোথাও না কোথাও ইংল্যান্ড থেকে আনা অনেক দামি এই জিনিসগুলোর খুব কম দামে নিলাম হোত।

জাম্বিয়ায় সাড়ে তিন বছর কাটানোর পর সপরিবারে দেশে ফিরে এলাম। ভীন দেশ যতদিন অজানা থাকে ততদিনই ভালো। তাকে জানা হয়ে গেলে অকর্ষণ কমে যায়। সে সময়ে একমাত্র নিজের দেশই তৃপ্তি দেয়, সে যেমনি হোক না কেন। সেকানেই যে মা বাবা আত্মীয় পরিজন আছে।

"এদেশ আমার এদেশ, এই মাটিতে জন্মেছি মা,
জীবন মরণ তোমার স্মরণ, তোমার চরণ ধূলি দাও মা"

With Best Compliments

from

Smart Deal Bazaar

Fresh vegetables distributers, importers, wholesalers &

Retailers Indian & Srilankan spices & groceries

40 Stoddard Road, Mt. Roskill, Auckland, Ph: 09 620 6821

513-a Sandringham Road, Auckland

India , Rajasthan through my eyes

-Svetlana Banerjee

The one secret to falling in love with India, is to embrace her wholeheartedly with open arms. Trust her and accept her for who she is. Let her hold you by the hand; Only then will she be able to show you that beyond the imperfections and extremities you see on the surface there lies a place which can give you more happiness, joy, rich culture, beauty, enlightenment, knowledge, and uniqueness than you could've imagined. The imperfections become some of the most cherished and precious memories. In amongst all the chaos on the streets you realise that there is a strange satisfaction and bliss which lies in the complete disorderliness of things. There is this immeasurable sense of hope and possibility, filling the country to its rims. She is still in her teenage days with so much room for growth and development.

The moment you land in India, you are snatched away from everyday life and all the trivial worries which come with it, and you are shown what really matters in this world. India teaches you to appreciate the small things and to be content with what you have. It shows you the definition of hard work, as people work day and night selflessly to earn each and every penny to feed their family. India shows you how vibrant societies who dwell in the same country can be, as different cultures and traditions emerge from regions of the same nation. It is home to a vast array of boundless history, which ranges from the periods of the Mughal Empire, of British and French colonization. This is my experience of India…

We visited Jaipur for the first time and in a bewildering way it captured all of our hearts within minutes. The rich culture could be felt in every corner of the beautiful pink city. History was etched through every alley, and laughter was heard through every village. The music, the architecture, the clothes, and the jewellery- everything was authentic, traditional, and unique. The locals held onto their culture and heritage as if it was their prized possession. It did not matter that they lived in small villages with only basic necessities- they were rich in values, culture, and love and that is what kept them so happy.

We were lucky enough to stay at a stunningly beautiful place called the Talaibagh Palace Hotel- far from the busyness of the city, surrounded by farmland and village. The whole experience was nothing short of a dream- marble walls, massive gates leading in, and banquets of authentic food. On our first night in Jaipur we explored the nearby villages. While everything that happened that night was very mundane in the eyes of the locals, it became one of our most memorable experiences. The villagers of the elephant village welcomed us into their haven like we were their own. They didn't hesitate once to make us feel like at home as they served us home-made food and made seating arrangements.

I don't know many places in the world where you would get to feel this sense of love and belongingness in a place so far from home. snippets from Jodha Akbar and Bajirao

carved through it. The sound and light show brought the place to life- it was like travelling through the history of the beautiful Amer. You could almost picture Maan Singh riding his horse into the fort as he would back in that time. When we returned in daylight, it was confirmed that all my fairy tale dream castles had come to life. . With its red and white sandstone, intricate designs, and unique architecture with a blend of Rajput and Hindu style, it is easily one of the most extraordinarily beautiful man-made places I have ever seen. The Hawa Mahal and Jal Mahal were equally spectacular in their own ways.

Another place we visited was Mumbai. It was full of life, and full of this passion and craziness that was infectious. The cars would constantly beep at each other, people would shout on the roadside and there was just complete disorder everywhere. Coming from a place where there is minimal disorder, strict rules, and politeness on the road it is hard to take in the complete insanity on the streets of Mumbai. You could either develop negative views about the place and remain rigid about the chaos, or you could open up and learn to love the craziness. I do not think the locals would want it any other way.

I will never forget the girl who tried selling her bubbles to me. Her exact words were "time pass ke liye hi lelo" meaning if you don't need it just take it to pass your time. This little girl was who was meant to be playing with her friends, attending school, and simply being a kid, was selling bubbles to me. Her and her family must have had to work so hard for everyday needs yet her smile and cheekiness never left her face as she continued to find humour in the smallest things. She was happily roaming the beachside, shouting with her friends, least bothered about the trivial worries of life-yet here we are in our comfortable lives constantly worrying about tomorrow, and what will happen next.

India in all her uniqueness showed me that sometimes you need to blow some bubbles, enjoy life, and embrace the moment. It is okay if everything is not perfect- there is beauty in imperfection and it exists everywhere. You just need to ensure that along with open eyes, you embrace the world with open arms.

With Best Compliments

From

Gulati Food and Spices

An Indian Grocery Store

gulatifoodandspices@gmail.com

687 SANDRINGHAM ROAD, MT. ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 620 8685

The Namesake and I

- Ditoya Ghosh

When I found out we were to study 'The Namesake' by Bengali author Jhumpa Lahiri in our Literature class, nobody understood why I was so anxious. The story starts by narrating the lives of Ashima and Ashoke Ganguli who move from Kolkata to Massachusetts in the USA. Later on in the book it follows their son, Gogol Ganguli, who struggles to find his own identity, trying to fit in with Americans while also being exposed to Bengali customs and ways. I was nervous to study this because what if someone made an ignorant snide comment about Bengalis? I was scared that I would take it much more personally than usual since this story was specifically about Bengalis and their customs, not just about Indians in general. Thankfully my classmates are all decent human beings and nobody said anything rude. However they asked me quite a few questions out of genuine curiosity. Questions such as:

"How do you all drink water by holding the cup up above your head and not letting it touch your lips?"

"Why do you count using the lines on your fingers? Why not just use each finger to show the number one?"

"Why do the characters' sandals have to be from Bata specifically?"

"Why is a baby eating rice for the first time such a big deal?

"Why do you wear white to funerals?"

Some of these questions I found quite humorous such as the one about how we drink water. I never realised these things were uncommon.

I found myself realising that I could relate to this story much more than I thought I would.

I saw my parents in Ashoke and Ashima. Lahiri's recount of the parents first moving to Massachusetts was almost parallel to my parents moving to Auckland. Ashima and Ashoke meet their first Bengali friends the Mitras, Banerjees and the Nandis which coincidentally were also some of the first friends my parents made in Auckland, too. These are all very common Bengali last names but as I had never seen them as names for characters in a book before. It felt unusual for me but exciting nonetheless. You can only imagine my excitement when I saw there was a character named Ghosh in the book.

Names are a huge part of this book. Ashima and Ashoke desperately wait for Ashima's grandmother to send a letter with the *bhalo nam* she has chosen for their child. However in America, a baby cannot leave the hospital without a birth certificate which requires an official name. They decide that their son's *dak nam* will be Gogol, after Ashoke's Russian favourite author Nikolai Gogol but they end up having to put this on his birth certificate instead of his official name. The letter never ends up arriving, years pass and the name Gogol sticks. Gogol hates this name. He hates that his name is both "absurd and obscure, that it has nothing to do with who he is, that it is neither Indian nor American but of all things Russian". Gogol goes through what I'm sure all kids with unusual names experience growing up in a Western country and in this, I wholeheartedly relate. 'Ditoya' isn't even a common name amongst Indians. The substitute teacher's awkward pause before pronouncing your name whilst calling the roll can feel like hours, this eventually causes you to raise your hand and say "I'm here!" before they even begin to butcher it. The Westernised pronunciation of our names that we adopt and begin introducing ourselves as becomes normal, never finding your name on anything in a gift shop becomes normal (there will never be a Coke bottle that says "Share a Coke with Ditoya!"), people not learning our names until we have met several times, people trying to give you shorter nicknames in order to make our names easier for themselves to remember (Eg. Didi, Diti, DG...etc) all becomes a regular occurrence. The list of these scenarios is very long. So when people with names like 'Ronald' and 'Jane' complain that Gogol is overreacting and being whiny about his name, I can't help but get annoyed. They would never understand.

I saw myself in Gogol and in problems he faced. Simultaneously feeling out of place in one's motherland and in one's birthplace, his struggle to find a balance between his Bengali side and his American side (in my case, Kiwi side), wondering exactly how much should we try to assimilate into Western cultures and how much is okay before it's considered to be "forgetting your roots"? Personally, I think I've come to peace with all these now and it's never explicitly stated in the book but I guess Gogol has too.

একজন সুখী মানুষ

(ঊনবিংশ শতাব্দির রুশ কথাশিল্পী আন্তন চেখভের একটি ছোটগল্পের কনস্টান্স গার্নেট-কৃত ইংরাজি অনুবাদ 'A happy man' থেকে বাংলায় অনুদিত। বাংলা অনুবাদক ওয়েলিংটনবাসী **দিলীপ কুমার দাস**।)

পিটার্সবার্গ-মস্কো রেললাইনের জংশন বোলোগোই থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ছেড়ে যাবার মুখে। তার ধোঁয়াভরা একটা কামরার আলো-আঁধারিতে পাঁচজন যাত্রী বসে বসে ঝিমুচ্ছে। তারা কিছুক্ষণ আগে খাওয়া-দাওয়া করেছে এবং এখন শুনশান কামরায় তাদের সীটে জমিয়ে বসে ঘুমোনোর তোড়জোড় করছে। এই সময় কামরার দরজা খুলে ছিপছিপে, লম্বা, ভাবলেশহীন মুখওয়ালা একটি মূর্তি প্রবেশ করল। তার মাথায় একটি হালকা কমলা রঙের টুপি এবং গায়ে ধোপদূরস্ত ওভারকোট। দেখে মনে হবে জুলে ভার্নের উপন্যাসের কোন রিপোর্টার অথবা রঙ্গমঞ্চের কোন নায়ক। ঘনঘন গভীর নিশ্বাস নিতে নিতে মূর্তিটি কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল এবং চোখ কুঁচকে সীটগুলোকে দেখতে দেখতে বলল, "নাঃ, আবার ভুল। ... ... আচ্ছা শয়তানের পাল্লায় পড়েছি! ... আবার ভুল কামরায় ঢুকে পড়েছি।"

যাত্রীদের একজন তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে বলল, "আরে, আইভান আলেক্সিয়েভিচ যে! তুমি কোথা থেকে উদয় হলে? তুমি আইভানই বট তো?"

আগন্তুক ভদ্রলোক শূন্যদৃষ্টিতে যাত্রীটির দিকে তাকাল এবং তাকে চিনতে পেরে হাততালি দিয়ে বলল, "আহ! পিয়োত্র পেত্রোভিচ! কতগুলো শীত-গ্রীষ্মের পর তোমার সাথে আবার দেখা। আমি জানতাম না যে তুমিও এই ট্রেনেই আছো।"

"কেমন আছো তুমি?"

"আমি ঠিকই আছি। কিন্তু মুস্কিল হল যে আমি আমার কামরা হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে পাচ্ছিনা। আমি একটা গর্দভ। আমার ধোলাই হওয়া দরকার।" ভাবলেশহীন ভদ্রলোক মৃদু হেসে একটু টলমল করে উঠল। সে বলল, "আশ্চর্য্য ব্যাপার অবশ্যই ঘটে। গাড়ী ছাড়ার দ্বিতীয় ঘণ্টি বাজার পর আমি একগ্লাস ব্র্যাণ্ডির সন্ধানে গেলাম এবং পেলামও। তারপর ভাবলাম পরের স্টেশন তো অনেক দূরে, তাই আর এক গ্লাস খাই। সেই গ্লাসটা যখন শেষ করছি আর ভাবছি তখন তৃতীয় ঘণ্টি বাজল। আমি দৌড়ে গিয়ে প্রথম কামরাটাতেই উঠে পড়লাম। আমি একটা ইডিয়ট!"

পিয়োত্র পেত্রোভিচ বলল, "তোমাকে দেখে তো খুব ফুর্তিতে আছো বলে মনে হচ্ছে। এস, এখানে জায়গা রয়েছে। বসে পড়।"

"না, না, আমি আমার কামরায় যাই। গুড বাই।"

"অন্ধকারে ভাল করে না দেখতে পেলে দুটো কামরার মাঝের ফাঁক দিয়ে তুমি পড়ে যেতে পার। এখন এখানেই বসে পড়। পরের স্টেশন যখন আসবে তখন নিজের কামরা খুঁজে নিও। এখন বসে পড় তো।"

আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইতস্ততঃ করে পিয়োত্রের মুখোমুখি বসে পড়ল। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল এবং সে খুব ছটফট করছিল – যেন কাঁটার উপরে বসে আছে।

পিয়োত্র পেত্রোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

"আমি? ... মহাশূন্যে ...! আমার মাথা এখন এমন গোলমেলে হয়ে গেছে যে আমি বলতে পারব না কোথায় যাচ্ছি। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় আমি সেখানে যাই। হাঃ, হাঃ। বন্ধু, তুমি কি কখনও সুখী বোকাকে দেখেছ? দেখনি? তাহলে এখন একজনকে দেখ। মরণশীল সকলের মধ্যে সবচেয়ে সুখীটিকে দেখ। আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ না?"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটু ইয়ে ... মানে ... পান করেছ। ... এই সামান্য একটু!"

"আমি বলতে সাহস করি যে আমাকে এখন অতিশয় বোকা বোকা দেখাচ্ছে। আমার কাছে আয়না নেই। থাকলে আমার মুখের ভাবটি কেমন দেখতাম। বন্ধু, আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটি গর্দভ। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমি হনিমুনে চলেছি! আমি গর্দভ নই তো কি?"

"তুমি ... তুমি বিয়ে করেছ?"

"হ্যাঁ, আজকেই দোস্ত! আমরা সোজা বিয়ের অনুষ্ঠান সেরেই আসছি।"

এরপর অভিনন্দন এবং আনুষঙ্গিক কথাবার্তা চলল। "তাহলে তুমি এখন একজনের জীবনসাথী!" হেসে বলল পিয়োত্র পেত্রোভিচ। "তাই তুমি অমন ফুলবাবুটি সেজেছো!"

"সত্যিই তাই। আর আনন্দে মজে থাকার জন্য গায়ে আতর মেখেছি। আনন্দে আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি। ... কোন চিন্তা নেই ... কোন ভাবনা নেই ...। শুধু একটা আনন্দের আবেশ, ... একটা ভাললাগার অনুভূতি। ...

চেখভের আমলে রাশিয়ায় ট্রেন ছাড়ার আগে তিনবার ঘন্টা পড়ত। প্রথম ঘন্টা পনের মিনিট আগে, দ্বিতীয় ঘন্টা পাঁচ মিনিট আগে এবং তৃতীয়

শয়তানই জানে একে কি বলে। ... আগে কোনদিন আমার এত ভাল লাগেনি!"

আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ চোখ বন্ধ করে মাথা দোলাতে লাগল।

"আমি সত্যি সত্যিই অত্যন্ত সুখী। চিন্তা করে দেখ ... ... আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার কামরায় যাব। সেখানে জানালার ঠিক পাশটিতে একজন বসে আছে। বলতে কি সে তার সর্বসত্তা দিয়ে তোমাতে ... মানে আমাতে সমর্পিত। ছোট নাক, ছোট ছোট আঙ্গুলওয়ালা স্বর্ণকেশী ... আমার ছোট্ট প্রিয়া ... আমার ছোট্ট পরী ... আমার ছোট্ট পুতুল। আমার হৃদয়ের মক্ষীরানী – তার ছোট ছোট পা দুটি আমাদের পায়ের মত চাষাড়ে, থ্যাবড়া পা নয় - পরীদের ছোট্ট পায়ের মত। কিন্তু তোমরা বুঝবে না, তোমরা বিষয়ী লোক কিনা - সব কিছুকেই কোন না কোন ভাবে বিশ্লেষণ করাই তোমাদের স্বভাব। তোমরা শীতল-হৃদয় ... অবিবাহিত। যখন তোমাদের বিয়ে হবে তখন আমার কথা মনে কোরো। তখন তোমরা বলবে এখন আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ কোথায়।"

"হ্যাঁ, এক্ষুণি আমি আমার কামরায় যাব। সেখানে গভীর আগ্রহে আমার প্রতীক্ষায় সে বসে আছে। আমাকে দেখেই সে মৃদু হাসবে, আর আমি দুই আঙ্গুল দিয়ে তার থুতনিটা একটু তুলে ধরব।"

আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আনন্দে বকবক করতে থাকল।

"তারপর আমি আমার মাথাটা তার কাঁধে রেখে কোমর জড়িয়ে ধরব। কবিত্বময় সেই আলো-আধাঁরিতে সব নিশ্চুপ, শুনশান। সেই রকম মুহূর্তে আমি গোটা পৃথিবীকেই জড়িয়ে ধরতে পারি। পিয়োত্র পেত্রোভিচ, এখন তোমাকে আমায় জড়িয়ে ধরতে দাও।"

"অতি অবশ্যই! আনন্দের সঙ্গে।"

দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হল আর তাই দেখে অন্য যাত্রীরা হেসে লুটোপুটি। সুখী বরটি বলেই চলল, "এইসব বোকা বোকা কাজগুলো অথবা উপন্যাসে যাকে রোমান্স বলে তা সম্পূর্ণ করার জন্য ট্রেনের খানাকামরায় গিয়ে একজন আরো দু-তিন গেলাস পান করে। তারপর তোমার মাথার মধ্যে, তোমার হৃদয়ে রূপকথার চেয়েও মজার জিনিস ঘটতে থাকে। আমি একটা হেঁজিপেঁজি লোক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমি গোটা জগৎকেই আলিঙ্গন করি।"

আনন্দে বেসামাল নববিবাহিতের এই আনন্দোচ্ছাস অন্য যাত্রীদেরও সংক্রামিত করল। তাদের ঘুম কোথায় পালিয়ে গেল! একজনের বদলে আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচের এখন পাঁচজন শ্রোতা! সে নেচেকুঁদে, মুখভঙ্গী করে বকর-বকর করেই চলল। তার হাসিতে অন্য সবাই যোগ দিল।

"ভদ্রমহোদয়গণ, কোন ভাবনা-চিন্তা করার দরকার নেই। যদি পান করতে চান তো পান করুন। তা ভাল কি মন্দ, সে বিচারে কাজ কি? ওসব ফিলসফি আর সাইকোলজির কচকচি। গুলি মারুন ওদের!"

এমন সময় কামরার মধ্যে গার্ড ঢুকল।

আমাদের বরটি তাঁকে দেখে বলল, "মহাশয়! আপনি যখন ২০৯ নম্বর কামরায় যাবেন তখন জানালার ধারে বসা এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাবেন। তাঁর মাথায় একটি ধূসর রঙের টুপি। সেটিতে একটি সাদা রঙের পুতুল-পাখি আটকানো আছে। আপনি দয়া করে তাঁকে বলবেন যে আমি এই কামরায় আছি।"

"ঠিক আছে, মহাশয়। আমি তাঁকে একথা বলব। কিন্তু এই ট্রেনেতো ২০৯ নম্বর কামরা নেই, ২১৯ নম্বর আছে।"

"ওই একই হল। ২১৯ নম্বরই সই। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন! ভদ্রমহিলাকে বলবেন যে তাঁর স্বামী ঠিকই আছেন।"

হঠাৎ আইভান আলেক্সিয়েভিচ তার মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে বলে উঠল, "স্বামী, ভদ্রমহিলা? ... সব মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল। স্বামী ... হাঃ ... হাঃ। আমিতো একটা কুকুরছানা ...লাথি খাওয়ার যোগ্য। আর এখন আমি কিনা ... স্বামী। আচ্ছা ইডিয়ট। আর সে গতকালও ছিল একটা পুঁচকে মেয়ে...। আজকে? ... ভদ্রমহিলা। ব্যাপারটা সত্যিই মজার।"

অন্য যাত্রীরা বলল, "এখনকার দিনে একজন সুখী মানুষকে দেখতে পাওয়া সাদা হাতি দেখার মতই বিস্ময়কর।"

"তা বটে!" আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ তার লম্বা পাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "কিন্তু কার দোষ? তুমি যদি সুখী না হও তো সে তোমার নিজের দোষে। তাছাড়া আর কি হতে পারে? মানুষ নিজেই তার সুখের স্রষ্টা। তুমি যদি সুখী হতে চাও তো সুখী হবে। আর না চাইলে হবে না। কিন্তু তোমরা তো সুখী হতেই চাও না!"

"কেন? কেন? তুমি কি করে সেটা বুঝলে?""

"খুব সহজ। প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের জীবনে একটা সময় আসে ভালবাসার জন্য। যখন সেই সময় আসবে তখন তুমি আগুনের মত জ্বলে উঠবে। কিন্তু তোমরা প্রকৃতির সেই আহ্বানে সাড়া দাও না, অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকো। আইনেই আছে প্রত্যেকটা মানুষ সময় হলেই বিয়ে করবে। বিয়ে ছাড়া কি মানুষ সুখী হতে পারে? সুতরাং বিয়ের সময় হলে বিয়ে করবে। এব্যাপারে গড়িমসি করার দরকার কি? কিন্তু তোমরা বিয়ে না করে অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকো। শাস্ত্রেই বলেছে, মদ্য মানুষের হৃদয়কে উৎফুল্ল করে। সুতরাং তুমি যদি সুখী হয়ে থাকো এবং আরো সুখী হতে চাও তবে খানাকামরায় গিয়ে একটু পান করে এস। বেশী চালাকি কোরো না। মহাজন বাক্য স্মরণ করে তাঁদের মহান পথই অনুসরণ কর।"

"তুমি বললে যে মানুষ নিজেই নিজের সুখ সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি দাঁতের ব্যথায় বা দজ্জাল শাশুড়ীর পাল্লায় পড়ে তার সুখ নষ্ট হয়, তবে সে কি শয়তান?

সুখ-অসুখ সবকিছু সুযোগের উপর নির্ভর করে। এই এখন যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে তবে তুমি অন্য সুরে গান ধরবে।"

"যত্তো সব বাজে কথা," আমাদের বরটি বলল। "রেল-দুর্ঘটনা বছরে এক-আধবার ঘটে। আমি দুর্ঘটনার জন্য ভীত নই। দুর্ঘটনা ঘটার এখন কোন কারণও নেই। দুর্ঘটনা হল ব্যতিক্রম। তা ভুলে যাও। আমি এই নিয়ে কথা বলতে চাই না। ওহ্, আমার মনে হচ্ছে সামনেই একটা স্টেশন আসছে।"

পিয়োত্র পেত্রোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ? মস্কো? না আরো দক্ষিণে?"

"তোমাকে আশীর্বাদ করি। আমি আরো দক্ষিণে কি করে যেতে পারি? আমি তো উত্তরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু মস্কো তো উত্তর দিকে নয়।"

"আমি তা জানি। কিন্তু আমরা তো পিটার্সবার্গ যাচ্ছি," বলল আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ।

-

"আমাদের ক্ষমা কর। আমরা মস্কো যাচ্ছি।"

বরটি বিস্মিত হয়ে বলল, "মস্কো! তুমি কি বলতে চাও?"

"তাজ্জব ব্যাপার! তুমি কোথাকার টিকিট কেটেছ?"

"পিটার্সবার্গের।"

"তাহলে তো তোমাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। তুমি ভুল ট্রেনে চেপেছ।"

এরপর খানিকক্ষণ সব নিশ্চুপ। বরটি উঠে দাঁড়িয়ে তার সহযাত্রীদের দিকে শূণ্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পিয়োত্র পেত্রোভিচ ব্যাখ্যা করল, "বোলোগোয়েতে তুমি ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছ। দু গ্লাস ব্র্যান্ডি খেয়ে তুমি ডাউন ট্রেন ধরেছ!"

আইভান অ্যালেক্সিয়েভিচ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল। কামরার মধ্যে দ্রুত পায়চারি শুরু করল। সে সখেদে বলল, "আচ্ছা ইডিয়ট আমি। শয়তানের পাল্লায় পড়েছি। এখন আমি কি করব? আমার বউ তো অন্য ট্রেনে একা একা আমার অপেক্ষায় বসে আছে। নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে। ওহঃ, আচ্ছা গাধা আমি!" বরটি তার সীটে বসে ছটফট করতে লাগল, যেন তার ফোঁড়ার ওপর কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে। সে ককিয়ে উঠল, "আমি খুব অসুখী মানুষ! আমি এখন কি করব? ... কি করব ... ?"

অন্য যাত্রীরা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। "সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পরের স্টেশনে নেমে তোমার বউকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবে। আর সেখান থেকে 'পিটার্সবার্গ এক্সপ্রেস' ট্রেনটা ধরবে। তাহলে বৌয়ের আগেই তুমি পিটার্সবার্গ পৌঁছে যাবে।"

নিজের সুখের স্রষ্টা বরটি কাঁদতে কাদঁতে বলল, "পিটার্সবার্গ এক্সপ্রেস! আমি ঐ ট্রেনের টিকিট কাটব কি করে? সব পয়সা-কড়ি তো বৌয়ের কাছে।"

অন্য যাত্রীরা হেসে, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে, চাঁদা তুলে আমাদের সুখী মানুষটির টিকিট কাটার জন্য টাকা যোগাড় করে দিল।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড।

"The happy man only feels at ease because the unhappy bear their burdens in silence, and without that silence happiness would be impossible." - Anton Chekhov.

কে ওখানে?

কিশোর মিত্র

আমি অভিক। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাস। সবে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলার ডিগ্রির ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা শেষ করে আর্থিক স্বাবলম্বনের জোয়ারে গা ভাসিয়ে একটি কল সেন্টারে চাকরি নিয়েছি। অবশ্য কিছু কারনে দুটো বিষয়ে পরীক্ষা দিতে না পারায় ছয় মাস পরে ওই দুটো পরীক্ষায় বসতে হবে। তাই অন্তত আরো ছ'টা মাস এই শহরেই থাকবো। শরীর ও মন দুটোই মজবুত থাকায় কল সেন্টারের বেয়াড়া শিফ্টের কাজ নিয়ে বেশি কিছু ভাবিনি। আমার কাছে এটা আমার প্রথম চাকরি এবং ছাত্রজীবনের অবসান। অন্তত সাময়িক ভাবে তো বটেই। কেননা অন্তত একটা মাস্টার ডিগ্রী না হলে বাঙালী বাড়ির ছেলেদের তো আবার নাকি পুরোপুরি গোঁফ গজায়না। জানতাম যে একজন সাধারণ ছেলে হয়ে কখনো না কখনো আমাকেও সেই দিকে যেতে হতেই পারে।

ছোটবেলা থেকেই বন্ধুবাৎসল্য কিছু কম ছিল না কিন্তু বেশিরভাগ সময়টাই একটু একা থাকতে পছন্দ করি। নতুন চাকরিতেও একই সঙ্গে আরো কয়েকজন কলেজের বন্ধু যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি একাই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবো ঠিক করেছি। প্রচুর বাড়ি ঘর দেখলাম কিন্তু অতি স্বল্প পুঁজির জোরে বেশিরভাগ বাড়িই বাতিল করে দিতে হচ্ছে। প্রায় হাল ছেড়ে দেবো, এমন এক ছুটির দিনে হঠাৎ একজন এজেন্ট ফোন করে বললো, "স্যার, নাগেশ হিয়ার। আভি চলে আইয়ে যে পি নগর মে অক্সফোর্ড কলেজ হস্টেল কে সামনে। এক ঘর হ্যায় জো আপকো শায়েদ পসন্দ হোগা। আপকা বাজেট মে ভি আ জায়েগা।" এটা শোনার পর আমি তড়িঘড়ি তৈরী হয়ে এক ঘন্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম।

যেখানে এজেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম সেই জায়গাটা বেশ ব্যস্ত বলেই মনে হলো। কলেজের হোস্টেলের কাছে তাই আমার সমবয়েসী লোকজনের ভীড় তার উপর বেশ কিছু দোকান পাঠ আছে যার মধ্যে একটা ছোট্ট ঝুপড়ি বেঞ্চি পাতা চায়ের দোকান, এক দুটো টুক-টাক খাওয়ার দোকান আর এক বিশাল ঢাবা যার পুরোটাই একটা সুন্দর বাগানের মধ্যে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে সেখানে নাকি কর্ণাটকের কিছু ক্রিকেট কিংবদন্তি ও চিত্রতারকাদেরও আসা যাওয়া ছিল। তবে আমার উপার্জনে সেখানে সময় কাটানোর বা খাওয়া দাওয়া করার ক্ষমতা ঠিক হয়ে উঠবে না। যাই হোক, নাগেশকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো যে বাড়িটা আমি দেখতে চলেছি সেটা ওখান থেকে কিছুটা হাঁটাপথ। তাকে বললাম অল্প অপেক্ষা করতে যাতে আমি একটা কিছু ছোটোখাটো খাওয়ার জিনিস কিনে নিতে পারি দোকান থেকে। সকাল থেকে কিছু পেটে না পড়াতে পেটের ভিতরে ছুঁচোগুলো বেশ কুস্তিগীর হয়ে উঠেছে। দোকান থেকে একটা ডিমের প্যাটিস কিনে, খেতে খেতে নাগেশের সঙ্গে সেই বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

সেই জায়গা থেকে এক দু মিনিটের দূরত্বেই টের পেলাম যে খুব একটা জনবসতি নেই। তবে নতুন বাড়িঘরের কাঠামো দেখে মনে হলো যে এখানে একটা নতুন পাড়া তৈরি হচ্ছে। বালির পাথর আর ইট ভাঙা দিয়ে তৈরি কাঁচা রাস্তা আর মাঝে মধ্যে কিছু খালি জমি যাতে কিছু তৈরি শুরু হয়নি। কিছুদূর হাঁটার পর দেখলাম একটা সবেধন নীলমনি তৈরি দোতলা বাড়ি যাতে লোকজন থাকতে পারে। দুপুর বারোটা নাগাদ আমাদের দুজনকে দেখে কেন জানিনা মনে হলো যে আশেপাশের দুচারজন যা রাজমিস্ত্রী কাজ করছে, তারা আমার দিকে অবাক চোখে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। হালকা বিরক্তি হলো। ওরকম ভাবে তাকানোর কি আছে? তারা কাজ করছে বলে কি এ পাড়ায় আর কাউকে আসতে নেই? যাই হোক, সেই বাড়ির সামনে এসেই নাগেশ বললো "স্যার ইয়ে হি হ্যায় বহ ঘর"।

তখন জিজ্ঞাসা করাতে বললো যে বাড়ির মালিক এখানে থাকে না কিন্তু একতলাটা এবং দোতলাটা পুরোপুরি নিজের জন্যেই রেখে দিয়েছে। একদম তিনতলার ছাদে একটা ঘর আছে যেটা খালি আছে ভাড়া দেওয়ার জন্যে। সেটাই আমাকে দেখানো হবে। বাইরে একটা সিঁড়ি আছে যা দিয়ে দোতলা আর ছাতে যাওয়া যায়।

আমি ছাতে উঠলাম। উঠে দেখলাম যে ছাতটা বেশ বড়। সিঁড়ির কাছে একটা বেশ ঋষ্টপুষ্ট নারকেল গাছ যার বেশ কিছু পাতা ছাতের উপর নুইয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। আর একটা কালো রঙের সিনটেক্সের আলগা জলের ট্যাঙ্কও পড়ে রয়েছে। বেশ ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাত । নাগেশ চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলছে, তখন আমি একটু এদিক ওদিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম। এ বাড়িটাও ব্যাঙ্গালোরের বেশিরভাগ বাড়ির মতই অনেকটা বাক্সের মতন। কোনো "সানসেট" নেই, বাইরে দিয়ে সিঁড়ি আছে যাতে প্রত্যেকটা তলা আলাদা করে ভাড়াটেদের ভাড়া দেওয়া যায়। ঘরের দিকে নিচে একটা বিশাল মাঠ আর দুইদিকে দুটো ফাঁকা জমি। "আইয়ে স্যার ঘর দেখিয়ে" শুনতেই গেলাম ঘরের দিকে। ভিতরটা দেখে একটু অদ্ভুত লাগলো। পরিষ্কার লাগলো না ঠিক। কিছু মহিলাদের জামাকাপড় আর প্রসাধনী এক কোনায় পড়ে ছিল। সেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে নাগেশ বললো যে ওটার ব্যাপারে সে কিছু জানেনা কিন্তু পরিষ্কার সহজেই করে নেওয়া যাবে। আমি আর তাকে এ নিয়ে বেশি ঘাঁটালাম না। ঘরটা বেশ বড় যদিও প্রচুর আলো বাতাস খেলার মতো নয়। এক দিকের দেওয়ালে একটা ছোট জানলা আর বড় কাঠের দরজার কাছে একটা মাঝারি আকারের জানলা, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। এই ছিল ঘরে। আমি বাথরুম আর টয়লেট দেখতে চাওয়ায় সে আমাকে ছাতের অন্য দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলো। একটা ছোট টয়লেট আর আলাদা একটা মাঝারি আকারের বাথরুম। সে বাথরুম খুলতেই দেখলাম দেওয়ালে টাইল দিয়ে তৈরী মা টেডিবেয়ার তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বেশ সুন্দর লাগলো ছবিটা। কিন্তু দেখলাম সেই মা টেডিবেয়ারের কপাল কেউ খুব ভালোবেসে বেশ কিছু লাল রঙের টিপ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

সব দেখে বুঝলাম যে আগের ভাড়াটে কোনো মহিলা ছিলেন যে সবে ছেড়েছেন এবং কিছু পরিষ্কার না করেই চলে গেছেন। এজেন্টকে বললাম "মুঝে ঘর পসন্দ হ্যায়। লেকিন পিছলা কিরায়দারকা ইয়ে সব সামান আজ ব্যাগ মে লেকে দূর কহি ফেক দুঙ্গা"। আসলে বাক্স পেট্রা নিয়ে যখন থাকতে আসবো, সঙ্গে এক দুজন বন্ধুও আসতে পারে আর ঘরে মহিলাদের জিনিসপত্র আর টিপ দেখলে বিনাপয়সায় ঠাট্টার পাত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাই করলাম। সব সেই টিপ আর জিনিসগুলো একটা প্লাষ্টিকের বাগে ভোরে নাগেশকে জানিয়ে দিলাম যে আমি দু এক ঘন্টার মধ্যেই তার দোকানে গিয়ে পয়সা কড়ির হিসেব মিটিয়ে দেবো। তারপর নিজের দুটো তালা কিনে বাড়ির দরজায় লাগিয়ে দেব আর বিকেল ছয়টা নাগাদ নিজের মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়বো। একটা বেশ মানসিক শান্তি পেলাম ভেবে যে এত অল্প পুঁজি থাকা সত্ত্বেও একটা পছন্দমতো বাসযোগ্য জায়গা পেয়েছি এই প্রচন্ড দামি শহরে। যদিও বাড়িটা যেখানে, সেটা ঠিক দেখলে শহর মনে হয় না।

বিকেল ছটা নাগাদ আমার বন্ধু তন্ময়কে নিয়ে সব মালপত্র বগলদাবা করে চলে এলাম নতুন বাড়িতে। মালপত্র বলতে যদিও একটা পাতলা তুলোর গদী, একটা কম্বল, একটা সুটকেস আর একটা কম্পিউটার ছাড়া কিছু নেই। আবার সেই রাজমিস্ত্রীর ঘুরে ঘুরে তাকানো পেরিয়ে বাড়ি পৌছে গেট খুলে ছাতে চলে এলাম। তন্ময় ছাতে রাখা সেই খালি সিনটেক্সের ট্যাঙ্ক দেখে একটা বেশ ভালো বুদ্ধি বার করলো। ওটা টেনে এনে সিঁড়ির মুখে রেখে দিলো। এটা নড়াচড়া করলে একটা আওয়াজ হবে যা শুনলে বোঝা যাবে যে অন্য কেউ ছাতে উঠেছে। অনেকটা সিকিউরিটি আলার্মের মতো। যাইহোক, জিনিসপত্র নিয়ে ঘরের কাছে গিয়ে দেখি একটা হলুদ রঙের মহিলাদের জামা পাট পাট করে দরজার সামনে কেউ রেখে গেছে! বেশ বিরক্তই হলাম। যে বাড়ি আমি ভাড়া করে নিয়েছি সেখানে কেন অন্য কেউ জামা রেখে যাবে? আবার জামাটা দেখে একটু চেনাচেনাও লাগলো কেননা আজ দুপুরবেলাতেই আমি ঠিক অবিকল একইরকম দেখতে একটা জামা ঘরের থেকে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছি। আমি সেটাকে দরজার ধারে সরিয়ে রেখে আমার সব সম্বল নিয়ে ঢুকে পড়লাম। খাটের অভাবে তোষোকটা মাটিতেই রেখে তার ওপর বালিশ আর বিছানার চাদর পরিয়ে দিলাম। তন্ময় কম্পিউটারটাকে ঘরের টেবিলে রেখে দিল। একটু জায়গা বাড়ানোর জন্যে টেবিলটাকে একদম দরজার কাছে জানলার সামনে ঠেলে দিলাম। জানলায় পরিষ্কার কাঁচের দুটো পাল্লা, তাই রোদটা একটু আটকানোর জন্যে পর্দার অভাবে একটা পাতলা কাপড় ঝুলিয়ে দিলাম। ঘর গুছিয়ে গেলাম বাথরুমে সাবান, শ্যাম্পু, শেভিং কিট ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতে। কিন্তু বাথরুমের দরজা খুলেই দেওয়ালে টেডিবেয়ারের দিকে চোখ পড়লো। এ কি! আমি তো সবকটা টিপ তুলে ফেলে দিয়েছি। তাহলে? সেগুলো একদম আগের মতোই ডিবেয়ারের কপালে কি করে? কারো তো ভেতরে ঢুকে এগুলো লাগিয়ে যাবারও কোনো সুযোগ ছিল না। আমি নিজে তালা বন্ধ করে গেছিলাম আর চাবি সবই আমার কাছে। তন্ময় টিপগুলো দেখে কিছুটা ঠাট্টা না করে থাকতে পারলো না। আমিও মুখে অল্প হাসি রেখে সেই টিপগুলো আবার খুলে নিলাম। নিজের মনকে খুব দৃঢ়ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে প্রথমবার আমি নিশ্চই টিপগুলো তুলিনি। নিশ্চই আমার মনের ভুল ছিল। কোনোরকমে বাকি গোছগাছ শেষ করে তন্ময়ের সঙ্গে বাইরে খেতে চলে গেলাম। কথা হলো ও নিজের হোস্টেলে ফেরত চলে যাবে আর আমি নতুন বাড়িতে ফিরে আসবো। পরের দিন সোমবার দুপুর তিনটেতে অফিসের গাড়ি তুলতে আসবে কলেজ হোস্টেলের সামনে। তিনটেতে তুলবে আর রাত এগারোটা নাগাদ ফেরত পৌঁছে দেবে। ইতিমধ্যে নতুন ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছি অফিসে।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমি বাড়ি ফিরলাম সেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেটে। অন্ধকার হয়ে গেছে আর হাটতে হাটতে আমি সেই টেডিবেয়ারের কপালে টিপের কথা ভাবছি। আসে পাশে কোনো মানুষ নেই। একটা জনশূন্য পাড়ায় একটাই বাসযোগ্য বাড়ি যাতে আমি একাই বাসিন্দা। একা থাকতে ভালোবাসলেও এটা একটু বেশিই শুনসান মনে হচ্ছিলো। আবার গেট খুলে উপরে উঠে ট্যাঙ্কটা দিয়ে ছাতে ওঠার জায়গাটা বন্ধ করে দিলাম। ঘরে পৌছে আমি অফিসে পরার জামাকাপড় ঠিক করে রেখে মোবাইল ফোনে কলকাতায় বাবা মা কে একটা আর আমার বান্ধবী পিয়ালীকে একটা ফোন করে, আলো নিভিয়ে সেদিন রাতের মতো শুয়ে পড়লাম।

আন্দাজ তখন রাত দশটা বাজে সবে তন্দ্রা এসেছে। মাটিতে পাতা তোষকের উপর শুয়ে, হঠাৎ মনে হল ছাতে কেউ একটা

হাটছে। মেঝের ওপর তোষকে শুলে কান তো একপ্রকার মেঝেতেই লেগে থাকে আর সবটাই শুনতে পাওয়া যায়। ভাবলাম যে সিঁড়ি আটকানো ট্যাংকের কোনো আওয়াজ তো পাইনি তাই নিশ্চই বাইরের নারকেল গাছের পাতা ছাতের সঙ্গে ঘষা খাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। নিজের এই ব্যাখ্যা বেশ মজবুত লাগলো। আবার ঘুমের দিকে মন দিলাম ওই খ্যাশ-খ্যাশ আওয়াজ শুনতে শুনতে। আবার চোখের পাতা লেগে এসেছে তখন কেন জানিনা মনে হলো ওই আওয়াজটা এখন আমার খুব কাছ থেকে আসছে। ঘুমের ঘোরে মনে হলো কেউ ঘরের মধ্যে হেটে বেড়াচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছুটে গেলো! উঠে বসলাম। কিন্তু মেঝেতে কান না রেখেও আমি এখন একটা হাঁটার আওয়াজ পাচ্ছি ঘরের ভেতরে। কাউকে বা কিছু দেখতে পাচ্ছি না ঘরে জানলা দিয়ে ঢোকা হালকা চাঁদের আলোতে! আমি একপ্রকার অসাড় হয়ে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আওয়াজটা মনে হলো ঘরের বাইরে চলে গেলো.....কিন্তু বন্ধ হলো না। মাঝে মধ্যে থামছে তারপর আবার হাঁটা শুরু হচ্ছে। এইসব শুনে আমার বেশ গা ছম ছম করে উঠলো। আবার এটাও মনে হলো যে আগের সপ্তাহে মাঝরাতের শিফট করেছি আর এই দুদিনও খুব একটা ঘুম বা বিশ্রাম কিছুই হয়নি। হয়তো সেই কারণেই নানারকম ভুলভ্রান্তি হচ্ছে মনের। একদিন ভালো করে বিশ্রাম নিলেই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। নানারকম প্রশ্ন মাথায় নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। আবার শুয়ে খ্যাশ খ্যাশ আওয়াজ শুনতে শুনতে বেশ কিছুক্ষন পর ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন বেলা এগারোটায় ঘুম ভাঙলো। পরিষ্কার ঝকঝকে দিন বাইরে দেখে মনটা ভালো লাগাতে গতকাল রাতের সবকিছুকে বেশ সহজেই ক্লান্ত শরীর ও মনের ভ্রম বলে বাতিল করে দিলাম। তৈরী হয়ে বাইরে খাওয়াদাওয়া করে অফিস চলে গেলাম। কয়েকজন রাজমিস্ত্রির চাউনি এড়াতে পারলাম না আজও।

রাত এগারোটা নাগাদ অফিসের গাড়ি আমাকে যথাস্থানে নামিয়ে দিলো। দিনটা বেশ ভালোই কেটেছে আজ। বাড়ি ফিরে আমি হাত মুখ ধুয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু এ কি? কে হাটে ছাতে? তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে আমি দরজা খুলে বাইরে আলো জ্বালিয়ে দিলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না! হেটে গিয়ে সিঁড়ির কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখলাম কেউ নিচের তলাগুলোতে এসেছে কিনা। না, দরজা গুলোতে তো বড় বড় তালা ঝুলছে! বাড়ির অন্যত্র কেউ হেটে বেড়াচ্ছে না যার আওয়াজ আমি ছাতের থেকে পাচ্ছি। যতই নিজেকে সাহসী মনে করি না কেন, এবার আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু কেউ বা কিছু একটা হেটে চলেছে গোটা ছাদ আর ঘর জুড়ে সারা রাত! আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কোনোরকমে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। কখনো ছাতে আর কখনো ঘরের ভিতর হাটার আওয়াজ শুনছি আর একটা ভীষণ মানষিক অশান্তি নিয়ে শুয়ে আছি। বাঘ যদি সামনে চলে আসে, মড়ার মত পরে থাকা যায়, অথবা অন্য কোনো ফন্দি করা যায় বাঁচার জন্য। কিন্তু যা চোখে দেখতে পাচ্ছিনা তার থেকে নিজেকে রক্ষা করার কি ফন্দি করতে পারি? যতটুকু টাকা সঞ্চয় করেছিলাম তা সবই গেছে এই বাড়ির ডিপোজিট দিতে গিয়ে। নিয়ম অনুযায়ী আমি সেটা ফেরত পাবোনা একটা গোটা বছরের আগে! এখন তো যাওয়ারও কোনো জায়গা নেই। আমাকে কোনোরকম ভাবে এখানেই থাকতে হবে। এই ভাবনা চিন্তা করতে করতে দেখলাম ভোরের আলো ফুটে গেছে আর এরইমধ্যে কোনো এক সময়ে সেই হাঁটাচলার আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে।

এক ছুটির দিনে আমি তন্ময়কে বললাম আমার প্রতি রাতের অভিজ্ঞতার কথা। যেমন ভেবেছিলাম তেমনি দেখলাম ও অনেকটা হেসেই উড়িয়ে দিলো আমার কথা। কিছুটা ইয়ারকি করতেও ছাড়লোনা। এক বোতল হুইস্কি কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বললো "এই নে তোর গৃহপ্রবেশের উপহার। একটু খেয়ে রাত্রে শুয়ে পড়বি, দেখবি দিব্বি ঘুম হচ্ছে। নিশ্চই আজকাল বাড়িতে গাজা টাজা টানছিস। ওসব না টেনে, এটা খা।" দেখলাম ওর সঙ্গে বেশি তর্ক করে লাভ নেই। বাড়ি ফিরে এলাম বন্ধুর দেওয়া উপহার নিয়ে। ঠিক করলাম যে রাত্রে ওই হুইস্কিই আমি খাবো....কিন্তু ঘুমোনোর জন্য না। মনে সাহস জোগানোর জন্য। খেয়ে আমি সারা রাত ছাদে বসে লক্ষ্য করবো কিছু দেখতে পাই কিনা। শুনতে যে পারবো সে একপ্রকার নিশ্চিত ছিলাম। অন্ধকার হয়ে গেলে আর ঘরের বাইরে ছাতে যেতে ইচ্ছে করে না। বাথরুম টয়লেটেও না কারণ সেগুলোও তো ঘরের বাইরে। তাই সব কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকে রাত কোনোরকমে কাটিয়ে দেই।

আজ আমি হুইস্কি খেয়ে রাত এগারোটার পর ছাতে গিয়ে নারকেল গাছের পাতার পাশে বসলাম। মনে হলো মদের নেশায় আমার সাহসটা বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। এতদিনে আমি ধরেই নিয়েছি যে এটি কোনো মানুষের আত্মা যার হাঁটাচলার আওয়াজ আমি রোজ রাতে শুনতে পাই। আমার আগে যে মহিলা ভাড়া থাকতেন তিনি নিশ্চই এইসব টের পেয়ে তাড়াহুড়োতে ছেড়ে চলে গেছেন। কিছুক্ষন বসে থাকার পরে আবার যথারীতি আমি শুনতে পেলাম একজোড়া পায়ের আওয়াজ। সে নিজের মতো পায়চারি করছে ছাতে। কখনো আওয়াজটা হালকা হয়ে গেলে বুঝতে পারছি যে এখন সে ঘরে ঢুকেছে। বন্ধ দরজা তার কাছে কোনো বাধা নয়। এক দেড় ঘন্টা এইরকম চলার পর মনে হলো সে কয়েক হাত দূরত্বে আমার পাশে এসে বসলো। কিছুক্ষন বসার পরে হটাৎ শুনলাম সেইরকম জায়গা থেকেই মহিলার আওয়াজে খুব চাপা গলায় কিছুটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। মাঝে মধ্যে মনে হলো সে বিড় বিড় করে কিছু একটা বলছেও। আমার ওই শুনে ভয়ে হুইস্কির নেশা ছুটে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষন সে চুপ করে আছে দেখে আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলাম "কে ওখানে? আপ কৌন হো?" বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো একটা ঠান্ডা হাওয়া আমার পাশ দিয়ে বয়ে গেলো। অবশ্য সেরকম দেখতে গেলে সেটা আমার ভয়ে ঘাম ছোটার কারনেও হতে পারে। আমি উঠে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ খুলতে দেখলাম সকাল হয়ে গেছে।

এটা আমি তন্ময়কে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বললো যে সে পরের শুক্রবার কাজের শেষে এসে আমার ঘরে থাকবে। সেও দেখতে চায় কি ব্যাপার। কথামতো শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ সে আমার সঙ্গে এলো রাত কাটানোর জন্যে তৈরী হয়ে। খুব বীরত্ব দেখালেও বুঝতে পারলাম যে তারও কিছুটা গা ছম ছম করছে। আমরা আসলে সবাই মুখেই বিশাল সাহসী। ঠেলায় পড়লে তাবড় তাবড় বীরপুরুষেরও অবস্থা ঢিলে হয়ে যেতে দেখেছি। দুজনেই হাত মুখ ধুয়ে একটু এটা সেটা গল্প করতে করতে কখন যেন মনে হলো আজ আর কোনো কারণে হাঁটাচলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না! একরকম বিরক্তিই হলো। যা রোজ হয়,আজ না হলে তো মিথ্যেবাদী হয়ে যেতে হবে তন্ময়ের কাছে। ঠাট্টার পাত্র হয়ে যাবো আমি। এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে তন্ময়ের সাথে গল্প করছি এমন সময়ে হঠাৎ ছং করে একটা হালকা আওয়াজ পেলাম। দুজনেই পেলাম কেননা তন্ময়ও দেখলাম দরজার দিকে তাকালো। মনে হলো বাথরুম থেকে এলো আওয়াজটা। একা থাকলে হয়তো কয়েকবার ভাবতাম

বাইরে যেতে কিন্তু দুজন থাকতে একটু সাহস পেলাম। বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খুলে ঢুকতেই একটা বড় অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। একটা ছোট্ট তাকে আমার একটা আয়না দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা ছিল যার সামনে আমার দাড়ি কাটার সরঞ্জামগুলো রেখেছিলাম। কিন্তু আয়নাটা কি ভাবে যেন ঐসব জিনিস ডিঙিয়ে মেঝেতে পড়ে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে!

কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এটা কি করে সম্ভব। বাথরুমের জানলাও তো বন্ধ! তর্কের খাতিরে এটাও তো সম্ভব নয় যে খোলা জানলা দিয়ে একটা জোর বাতাসের দমকা এসে এটা করেছে। দেখলাম তন্ময়ের চোখে মুখেও একটা বিস্ময়ের চিহ্ন। টুকরোগুলো তুলে মেঝেটা পরিষ্কার করে তাকের উপরেই রেখে দিলাম এই ভেবে যে পরেরদিন বাইরে ফেলে দেব। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে দরজাটা যেই লাগাবো, আবার ছং! আবার দুজনে মিলে গিয়ে দেখলাম ওই ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো আবার মেঝেতে পড়ে দুভাগ হয়ে গেছে! তন্ময় দেখলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছে এবার। তাহলে কি এই বাড়ির অশরীরি বাসিন্দাই কিছু বোঝাতে চাইছে? আমরা কোনোরকমে ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। "না রে ভাই, কেউ তো নিশ্চই আছে এখানে। কিছু বোঝাতে চাইছে আমাদের। অন্ধকার ফাঁকা রাস্তাঘাট এখানে না হলে আমি চলে যেতাম, কিন্তু তোর এ পাড়ার যা অবস্থা, আজ কোনোরকমে এখানেই থেকে যাই। কাল সকালে হোস্টেলে ফিরে যাবো। পারলে তুইও আমার সঙ্গে চল।" যদিও কথাটা ভালোই লাগলো, তবুও একটা ভিড় হোস্টেলে অন্যদের কাছে অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে থাকাটা খুব একটা আকর্ষণীয় প্রস্তাব বলে মনে হলো না।

কথা বলতে বলতে প্রায় রাত তিনটে হয়ে গেছে। মনে বেশ ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা নিয়ে দুজনেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ "ঠক ঠক" দরজায় করাঘাত শুনে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেলো। ভাবলাম কাঠের দরজায় হওয়ার দমকা লেগে আওয়াজ হতে পারে। আবার "ঠক ঠক ঠক" ... .নাহ এটা হাওয়া হতেই পারে না। এরকম পরিষ্কার, মানুষের হাতের আওয়াজ হাওয়ায় হতেই পারে না। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে দেখলাম যে খুব মৃদু ভোরের আলো ফুটেছে। "অভিক অভিক! ওটা কে রে?" তন্ময়ের ফিশফিশ শুনে সঙ্গে সঙ্গে জানলার দিকে তাকাতেই দেখলাম একটা আবছা কোনো মানুষের যেন ছায়ামূর্তী জানলার পাশ দিয়ে ছাদের কার্ণিশের দিকে হেটে যাচ্ছে। মনে তো হলো কোনো মানুষ কিন্তু লোক না মহিলা ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুজনেই ঝাঁপিয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। যেদিকে হেটে যেতে দেখলাম সেদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না! দুজনেই দেখার চেষ্টা করলাম কেউ লাফিয়ে ছাত বেয়ে নামছে কিনা। কিন্তু কেউ চোখে পড়লো না। এ ধরণের বাড়িতে তো আবার "সানসেট" নেই যে সে সহজে নেমে যাবে এতো তাড়াতাড়ি। একমাত্র ঝাপ দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। তার ওপর আবার বাড়ির এদিকে বিশাল মাঠ। শেখান দিয়ে দৌড়ে পালাতে গেলেও তো আমরা দেখতে পেতাম।

ভোরের আলো তখন কিছুটা ফুটেছে। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘরে ফেরার সময়ে দেখি সেই সিনটেক্সের ট্যাঙ্ক তখনো সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে রেখেছে। তার মানে অন্তত রক্ত মাংসের কোনো মানুষ ছাদে আসেনি। যদিও আগেই আঁচ করেছিলাম, এখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আমরা যা দেখলাম আর শুনলাম, এ কোনো মনের ভ্রম হতেই পারেনা। দুজনেই একই জিনিস শুনেছি আর দেখেছি। "সকাল হয়ে গেছে আমি যাই। পরে কথা হবে।" একথা বলেই তন্ময় নিজের জিনিস নিয়ে হনহন করে চলে গেলো। ওকে আর আমি আটকাবার চেষ্টাও করলাম না।

ওই রাতের পর থেকে আমি জোর দমে আবার সস্তায় বাড়ি বা হোস্টেলের খোঁজ শুরু করলাম। কিন্তু আমার সামর্থের মধ্যে খুব একটা কিছু পাচ্ছি না। একমাত্র তন্ময়ের হোস্টেলের ভাড়াটা আমার সামর্থের মধ্যে। ওই ভুতুড়ে বাড়ির এজেন্টকে জিজ্ঞেস করতে সে আমাকে পরের দিন জানিয়ে দিলো যে বাড়ির মালিক আমার জমা রাখা টাকা ফেরত দিতে রাজি নয় এক বছরের আগে ঠিক যেমন সই করা রশিদে লেখা আছে। ওদিকে আমি একা এই বাড়িতে অন্য কোনো অদৃশ্য মানুষের উপস্থিতি টের পাই৷ শরীর ও মন দুটোই বেশ খারাপ হয়ে পড়ছে।

একদিন সাহস করে আমি কাজে নিজের ম্যানেজারকে একটু অনুরোধ করতেই সে আমাকে সন্ধে সাতটার শিফট দিতে রাজি হয়ে গেলো। আর রাজি না হওয়ারও তো কিছু নেই। ওরকম শিফট কেউ পারতপক্ষে তো আর করতে চায় না। সবাই চায় রাত্রে নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় ঘুমোতে। এক আমি ছাড়া! নতুন শিফ্ট ঠিক হলো। সন্ধে সাতটায় যাওয়া আর ভোর চারটেতে ফেরা।

শুরু হলো নতুন শিফট। ভোর চারটেতে যখন অফিসের গাড়ি ফেরত পৌছে দেয়, আমি বাড়ি ফিরি না। রাস্তার আলোয় চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে একটা সিগারেট খাই। কিছুক্ষন বাদে দুধওয়ালা আর পাউরুটিওয়ালা এসে দোকানে ডেলিভারি দিয়ে যায় আর পাঁচটা নাগাদ দোকানদার এসে উনুন জ্বালিয়ে চা আর কফি বানায়। সেই স্টিলের গেলাসে একটা গরম কফি খেতে খেতে মোটামুটি আলো উঠে যায় আর রাস্তাতেও কিছু লোকজন বেরোয় মর্নিং ওয়াক করতে। কফি খেয়ে আমি বাড়ি চলে আসি। এ বাড়িতে কয়েক মাস থাকার অভিজ্ঞতা বলে যে দিনের আলোয় আমি কিছু দেখতে বা শুনতে পারবো না।

এইরকম ভাবে আরো কয়েক মাস কেটে গেলো। হটাৎ একদিন

তন্ময় ফোন করে বললো "হোস্টেলে আমার ঘরে অন্য ছেলেটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই সপ্তার শেষে। আমি হোস্টেলের মালিককে বলে রেখেছি তোর কথা। শনিবার সবকিছু নিয়ে চলে আয়।" এই শুনে অনেকদিন পরে একটা মানসিক শান্তি পেলাম আর সেই শনিবারই নিজের জিনিস নিয়ে বাড়ি ছেড়ে উঠে গেলাম নতুন হোস্টেলে।

এখন ২০১৩, প্রায় দশ বছর কেটে গেছে সেই বাড়িতে শেষ রাত কাটিয়েছি। বিয়েও হয়ে গেছে বহুদিনের বান্ধবী পিয়ালীর সাথে। দু চার জায়গায় সন্ধ্যের আসরে বসে আমার সেই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার কথা গল্পের আকারে বলেছি। গল্প হিসেবে বড় একটা খারাপ শোনায় না। আজ সন্ধ্যেবেলায় দমদমে এক বন্ধু বুবাইয়ের বাড়িতে আড্ডা দিতে এসেছি তার আর তার স্ত্রী সোমার সাথে। বুবাই আবার ব্যাঙ্গালোরেই পড়াশোনা করেছে অক্সফোর্ড কলেজে। রসিয়ে চা তেলেভাজা খেতে খেতে ব্যাঙ্গালোরের বেশ পুরোনো কিছু গল্প করছিলাম, এমন সময়ে সোমা বলে উঠলো "আজ একটু ভূতের গল্প হোক"। তাতে দেখলাম বাকি দুজনও বেশ একসুরে "হোক হোক" সায় দিলো। "অভিক, তোমার ওই ব্যাঙ্গালোরের গল্পটা বলো না ওদের" বলে উঠলো পিয়ালী। অগত্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তারিণীখুড়োর আদলে চায়ের কাপে একটা চুমুক মেরে শুরু করলাম। যেই জায়গাটার নাম নিলাম আর বাড়ির আশেপাশের বিবরণ দিলাম, বুবাই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো "দাড়া দাড়া। তুই ওখানে থাকতিস? ওরকম সময়েই আমাদের কলেজের একজন সিনিয়র বাঙালি স্টুডেন্ট ওই পাড়ায় একটা বাড়িতে ছাতের ঘরে ভাড়া থাকতো। বালিগঞ্জের মেয়ে নীলাঞ্জনাদি। প্রেমে হোঁচট খেয়ে শুনেছি শেষমেশ ভাঙা কাঁচ দিয়ে নিজের হাত কেটে আত্মহত্যা করেছিল!" এই শুনে আমি পিয়ালীর দিকে তাকালাম। এতো বছর বাদে অবশেষে আমি আমার সেই অশরীরি সঙ্গিনীর পরিচয় জানলাম। ভগবানের কাছে তার অতৃপ্ত আত্মার শান্তি কামনা করি।।

With Best Compliments

From

SS Super Mart & Chennai Express

578 Sandringham Road

Phone: 0211 0953 36, 09 84942234

sureshdeva@hotmail.com, www.rrkfood.co.nz

Painting by: Agni Sen

Homage

Aritra Roy

Like the rocks
We all stand on
I take you for
Granted too long

The solid base
From which was born
My life of hopes
And dreams to come

The skills I aped
With greedy eyes
When my hands could
Not undo ties

The words copied
With haste unbound
When my mouth made
But gurgling sounds

The soft cuddles
Of tender care
That I soaked up
With princely air

You pulled me up
Nurtured me till
I had the strength
To do my will

And so it's right
No words suffice
For all that you
Did sacrifice

For you my Mum
And Dad of years
My gratitude
Is shown in tears

Thoughts for a chaotic world

Aritra Roy

They fight and swear and scream and moan
Their thoughts a grumbling dreary drone
Worlds crash apart and smother all
The sky falls down and leaves us small
But let them fight and moan and groan
While we devote our love for Thou
My Mother dear I know this sure
That while we’re Friends I’ll want no more
I’ll love all things with You within
Your Peace will shine out through the din
Till time itself wears out so thin
That all of them want You within

Aumn, Peace, Amen.

Broken

Sananda Chatterjee

Under such circumstance – what is my plight?
Nothing
Where do I stand in the great scale of things?
In between – luxury and slight
Discomfort from the cold weather
I'm ok – there is nothing wrong with my life.
Provided for, well kept, educated
Family, friends, job
Where is my distress? I am ok.
Not war torn, not impoverished.
Not dead in a fatal accident or by the fury of Mother Nature.
A few flawed personality traits,
A few tarnished relationships
A few failed connections.
So what? My walls are intact.
There are cracks, sometimes these are fences close to home

But that's just perspective – I have not suffered.
What suffering? Perspective.
I am grateful to my stars. You don't bother me.
Your opinions, they bother me even less.
Your presence in my universe, is only but a speck of dust
That momentarily irritates my eyes. And I wash it with cold water,
And it's clean. Tears, angst…brief interruptions in my otherwise fine life, between luxury and slight discomfort from the cold weather
I thank my stars. And my heart goes to you. Your suffering is greater than mine.
I haven't been in your position. If I was, I might have been
Broken.

Defiance, is easy

Sananda Chatterjee

I may have 10,000 things against me
But I don't have to fight for my keep
Defiance, is easy

I don't have to fight for my life
From external forces, or internal
Defiance, is easy

When I don't need to lie at night
Wondering if I will live to see another day
Defiance, is easy

I don't have to hide my feelings
My race, my creed, my sexuality
Defiance, is easy

My limbs are intact
My eyes can see all the Injustice in the
world unfolds
My ears can hear the shrill cries
That the wind carries
And I am a spectator
Defiance, is easy

You - you have many things to scream about
You don't. You stay silent. You fight.
You are the brave one. You have been
through hell, and
Then some more and here you stand.
Still, and ready
Shoulder to shoulder
When you stand next to me.
Defiance, is easy.

ক্যানভাস

সুদেষ্ণা গিরি

ক্যানভাসে এক জলছবি-

নানা রঙের তুলির টানে ,

উঁকিঝুঁকি মারে একদিকে অতীত

আর অন্যদিকে অজানা ভবিষ্যৎ |

তাঁর মাঝে আনাগোনা

সুখ দুঃখের ভেলা ,

আলো আঁধারের ছোঁয়া |

তবে আছে —

সব থেকে বড় আশা

কল্পনার প্রতি ভালোবাসা |

এই নিয়েই বাঁচা আবার

এই নিয়েই হারিয়ে যাওয়া ,

আছে তাতে ছন্দ আবার

ঘটে কখনো তাঁর পতন |

তবু সেই কল্পনার বাঁশি

বাস্তবের ঝড়ঝাপটার মাঝে

ছোট্ট একটি আশা,

Likopakhyan

শাশ্বত রায়

বলি ভাই শোন লাইক এর কথা
লাইক না করিলেই মনে লাগে বড় ব্যাথা
কটা লাইক কিরম লাইক কোথা লাইক কর?
বেশী কিছু না ভেবে শুধু লাইক মারো।

লাইক এর বর্ণনা কি করি সবে
কথাবামাত্র বন্ধ হয়ে
তাহা না করিলে যবে
ঘড়ি ঘড়ি দেখে সবে কটা লাইক হল
প্রোফাইল ছবির লাইক সর্বাগ্রে বড়
তারপরে আসে আমাদের "what are you upto"
বিচিত্র জায়গা সে কি আর বলি ভাইটু
আমি যাহা জানি বা না জানি তাতে যায় আসে না কিছু
লিখিতেই হবে আমাকে মেছেদা বা মাচু পিচু
লাইক এর গভীর সংযোগ আছে হেথায়
কখনও কখনও কমেন্ট তার আগে ধায়ে
খুব জ্ঞানী কথা হলে একটা লাইক মারো
কি হয়েছে যদি কিছু বুঝতে না পারো
নিজ সন্তানের ছবি হেথায়ে খুব মেগাহিট
উইথ "mom" উইথ "dad" তার পরে ঠিক
কোন ভাল খাবার দাবার যেন হয় নাকো মিস
Tag টা করতে যেন ভুলনাকো প্লিস ।

স্ট্যাটাস শেয়ার এক বর্ণনাময় গলি
দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে
কটা লাইক পেলি?
আসলে আমি বলি বাপু লাইক থাকা চাই কপালে
তুই হাঁকাস ৮০ আর আমি সেই পাতালে !

তবে তুমি যদি হও আবার celebrity মানুষ
গল্পটা অন্য পুরো লাইক ভর্তি ফানুস
হাজার দেড়েক লাইক not a miracle!
যদি তুমি পাও আবার তার সাথে ছবি
চটপট টাঙ্গিয়ে দাও লাইক পাবে হেবি।

তবে শেষ করার আগে বলি ।
এই পদ্য আমাকে বা কারুকে করেনা আক্রমন
লাইক ছিল লাইক থাকবে সঙ্গে সর্বক্ষণ
তুমি লাইক পাও যেন পুকুরে যটা কচুরিপানা
লাইক এর আমি লাইক এর তুমি লাইক দিয়ে যায় চেনা।

The War And My Brother

Pranya Kala

I was just a child
Someone old enough to play with toys and run around
Not see a nation crumble before my eyes
My elder brother -- I haven't seen him for days
Lord only knows where he is
Does he frolic in the fields of death to and fro
I guess I will never get to know
The crack of a gunshot
Wails and cries fill a cold violent afternoon
I rush outside to a carnage
of blood and bone

The war has come to an end
I try to stay strong
Strong is the one thing but I don’t have it in me
The western killings
The killers of my brother
A ruthless ‘haven’ of sorrow and despair
A monster hungry for lives
Heartbeats gone in a heart beat
The western killing fields
Not a place of peace but war

New beginnings

Deepika Roy

Some indistinct, fleeting memories rest underneath this bed of Autumn leaves.
Bare-handed I rifle through the sheets of bronze and cinnamon tinted petals,
Searching feverishly for hints, memorabilia
Of a past half-forgotten.

As the crusty crumbs of Fall rustle below the palms of my hands,
The barren tree lying before me
Sends me an old vision.
A vision of times past.
Few clear, few blurred.
Memories illuminated by the crimson hue of the heavens,
Allowing me to reminisce, recollect, and ruminate
Over the history of my life.

Beneath my branch of hindsight,
The fragrant evening air sways to the direction of turning pages in a rusty notebook.
Teeming with memoirs of a beloved childhood,
The brittle papers tear away
To merge with the hastening gust of a new beginning.

কবি নই

জয়ন্ত ভাদুড়ী

"তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি" -
বললাম আমি খুব অল্প চেনা একটি মেয়েকে ফোনে
"কিন্তু তুমি তো চেনো না আমায়" – বিস্মিত সে ,
"তোমাকে পেয়েছি আমি ,টেলিফোন গাইডের পাতায়"
শোনালাম কবিতা তাকে ।
"ধুর! এটা আবার কবিতা নাকি" – বলল সে
"দেখা করা যায় " সাহস নিয়ে বলি আমি
"মোটেই না, কারন আর যাই হও, তুমি কবি নয়"
"ওটা কবিতা নাই হতে পারে তবু লেখাটা ছিলো তোমায় নিয়ে,
তুমি সেটা বুঝেছ , শুনেছ সেও কি যথেষ্ট নয়?"
তবু সে বলল— "আর যাই হও , তুমি কবি নয়"-
তার উচ্চারিত শব্দ গুলো জন্ম দেয় ক্ষোভ
এবং সব শেষে ক্রোধ ।
এগুলি পরিবর্তিত হয় সফল সব কবিতায়
আমার কবিতা ক্ষ্যাতি রটে দেশে বিদেশে , নানা পত্র-পত্রিকায়
মাঝে মাঝে খুব গভীর থেকে শব্দ হয়
" আর যাই হও, তুমি কবি নয়" ।।

ভালোবাসা আছে ভালোবাসাতেই

স্বস্তিকা গাঙ্গুলি

এ খেলা খেলছে সবাই আজ,
আর দায় না নিয়ে বলছে,
ভালোবাসা নেই।
ভালোবাসা আছে সেই চাঁদের কাছে,
ফুলের কাছে, ধূপের কাছে,
সেখানে কোনো বিনিময় নেই,
শুধুই একতরফা গ্রহণ,
নেই কোনো মিলমিশ,
নেই কোনো আলিঙ্গন,
এভাবেই চলেছে জীবন
এক চাকা লিক সাইকেলের মতন!

ভালোবাসা, হ্যাঁ ভালোবাসা
তোমাকে পাওয়ার আশা
তাই বুকে নিয়ে ভালোবাসা খুঁজি,
সব পথ পেরিয়ে এসে বুঝি,
ভালোবাসা বুকের গভীরে
নির্বিঘ্নে আছে,
ধারে কাছে নেই কোনও দ্যুতি
তার দ্যুতি ছাড়া, তাকে
সারাটা সময় দেয় পাহাড়া
মনেরই প্রজাপতি,
যে অতি মোলায়েম,
যার ঠাঁই নেই এই কঠোর
লেনদেন হিসাবী বাস্তবে।

জীবন ভ্রাম্যমান

স্বস্তিকা গাঙ্গুলি

নোটের বরাদ্দ বান্ডিল থেকে
একটা নোট খরচ হয়ে গেল,
জীবন থেকে একটা বছর,
কত কথা বলা হয়ে গেল,
ভাবা হয়ে গেল কত ভাবনা,
বুঝল না মন, বুঝল না অধর।

কত পাতা ঝরালো গাছ,
হারালো ফুল ফল শাখা,
মনে রাখলো কি মৌমাছি প্রজাপতি!
পাখি, প্রাণিকুল ও ভ্রমর!

কত যুদ্ধ ঘটে গেল পৃথিবীতে,
কত প্রাণ বিনা দোষে হারালো জীবন,
শিশু নারী বৃদ্ধ ও বালক বালিকা,
ধর্ষিতা হলো কত নারী,
শোষণ ও প্রতিবাদ মুখর এ চরাচর।

বিপ্লবও খাটাল ভাড়ায়,
বিদ্রোহ উস্কে দেওয়া শোষণ যন্ত্রের
সুতোটানা পুতুল নাচ,
পুঁজি ও ক্ষমতার কূটনৈতিক চালে,
তথাকথিত সভ্যতা আদতে বর্বর।

একই কাজ দুই'জন ক'রে
এ ওকে সে তাকে দেয় দোষ,
একই রাস্তায় হাঁটে পাথর ও কাঁকড়-মাটি,
মোলায়েম উর্বর রসালো মাটির উপর।

এভাবেই বছর পাল্টিয়ে যাবে,
ক্যালেন্ডারের পাতা,
পৃথিবী ঘোরে তাই খন্ড সময়,
ছিন্ন ভিন্ন মাপে জীবন পাল্টিয়ে যায়,
দ্বন্দ্ব মূলক চিন্তায় অন্তর।

কি এনেছ? ফুল! সেও তো মৃত,
মৃত চিন্তার সাথে অনাহুত আবেগ,
যে কথা বলা হয়ে গেল,
ভাবা হয়ে গেল যে কথা,
তারাও তো মৃত! তবু তারই মাঝে,
কোনও কোনও কথা অবিনশ্বর।

Painting by: Rounak Giri

বাবার মতো বড়

সোহম সরকার

"এখনও তো বড় হইনি আমি,
ছোটো আছি ছেলে মানুষ বলে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড় হয়ে বাবার মতো হলে।"

কোন্ ছেলে না চায় তার "বাবার মতো বড়" হতে। সমস্ত সন্তানদেরই প্রথম হিরো হয়তো তাদের বাবা-ই। সুপারম্যান-ব্যাট্‌ম্যানরা যখন পৃথিবী কে বাঁচাতে ব্যস্ত, বাবাদের তখন চিন্তা কিভাবে নিজের সন্তানদের জগতটাকে আগলে রাখবে। ছেলে-মেয়েদের সুখের জন্য নিজের সমস্ত শখ আহ্লাদ বিসর্জন দেওয়া – এ কি কোনো সুপারহিরোর থেকে কোনও অংশে কম নাকি?

বাবার মতো হতে চাওয়ার ইচ্ছে আমার অনেক ছোটো বয়স থেকেই। "বিপুল দার বড় ছেলে" হিসেবে পরিচিত হতে বেশ ভালোই লাগত। তখন অবশ্য বাবার মতো হওয়া বলতে বাবার মতো লম্বা হতে চাওয়া, আর অপেক্ষায় থাকা কবে আমার বাবার মতো দাড়ি হবে। বাবার মতো দাড়িটা এখনো হয়ে ওঠেনি, তবে height-এ বাবাকে টপকে যেতে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। এখনো মনে আছে যেবার পুজোয় প্রথমবার বাবা আর আমি same সাইজের জুতো কিনেছিলাম, সেদিন কতটা আনন্দ হয়েছিল। বাবার জুতো বা বাবার জামা পরার আনন্দের সামনে নতুন জামা পরার আনন্দও বরাবরই ফিকে পড়ে যেত।

তবে অধিকাংশ বাঙালি ঘরের ছেলেদের মতো বাবাকে ভয়ও পেতাম প্রচন্ড। এমনকি আমাদের পড়তে বসার সময়টাও নির্ভর করত বাবা কখন আসবে, তার উপর। দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেলে বা বাবার গলার আওয়াজ পেলেই অন্য সব কাজ ফেলে বই নিয়ে বসে পড়তাম। অঙ্কের প্রতি বাবার প্রচণ্ড টান ছিল। বাবা ভীষণ ভাবে চাইত আমরা অঙ্কটা ভালো করে শিখি। বইয়ের দোকান খুঁজে খুঁজে নানান অঙ্কের বই নিয়ে আসত, আর আমাদের নিয়ে বসে সেগুলো শেষ করাত একের পর এক। আমরা যেগুলো করতে পারতাম না, সেগুলো বাবা নিজে কষে আমাদের বুঝিয়ে দিত। আর, আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, এত কঠিন অঙ্ক গুলো বাবা কিভাবে এত সহজে করে ফেলছে। ইচ্ছে জাগত, একদিন আমিও বাবার মতো নিমেষের মধ্যে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষে ফেলব। অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা জাগে এই ইচ্ছেপূরণ করতে গিয়েই।

যত বড় হয়েছি, মানুষটাকে যত বেশি চিনেছি, তত বেশি শ্রদ্ধা বেড়েছে মানুষটার প্রতি। এমনিতে মানুষটা অত্যন্ত সাধারণ। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেই পড়াশোনায় ইতি টেনেছিল, কাজ বলতে প্রোমোটারিং। তবে যে গুণটা এই সাধারণ মানুষটা-কে অসাধারণ করে তুলেছিল, তা হল তার মনুষ্যত্ব। চেনা হোক, অচেনা হোক – কারোর দরকার পড়লেই বাবা ঝাঁপিয়ে পড়ত তার সাহায্যার্থে। নিরলস ভাবে লোকের জন্য করতে দেখেছি এই মানুষটাকে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" – বইয়ে পড়া এই কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝেছিলাম বাবাকে দেখেই। জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা পেয়েছিলাম তার কাছ থেকেই – মানুষের জন্য বাঁচার শিক্ষা।

আমাদের মা কে হারানোর পর বাবার একমাত্র সম্বল বলতে ছিলাম আমরা দুই ভাই। আমাদের কখনও "তুই" করে সম্বোধন করত না, সবসময় "তুমি" করে বলত। কতবার আমাদের উপর রাগ করে দিনের পর দিন দেখা করেনি। আবার রাগ পড়ে যেতেই আমাদের পছন্দ মতো খাবার নিয়ে হাজির হয়েছে। পড়াশুনোর জন্য আমাদের দেশের বাইরে যখন আসতে হয়েছিল, বাবার যে আমাদের ছেড়ে দিতে কতটা কষ্ট হয়েছিল বুঝি, কিন্তু তাও হয়ত আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবটা কষ্টই সহ্য করে নিয়েছিল। Skype-এ যখন কথা হত বুঝতে পারতাম যে সে কতটা একা হয়ে গেছে। ভীষণ ইচ্ছে করত তাড়াতাড়ি পড়াশুনোটা শেষ করে নিজেদের residency-টা একবার হাতে পেলেই বাবাকেও নিয়ে আসব এখানে। সেই সুযোগটা আর সে আমাদের দিলো না। ধীরে ধীরে বাবা-ছেলের মধ্যে ভয়ের সম্পর্কটা কেটে গিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। কিন্তু বাবা হয়ত আমাদের থেকে মা-কে একটু বেশিই ভালোবাসত, তাই আমাদের কাছে এসে থাকার থেকে মায়ের কাছে চলে যাওয়াটাই বেশি পছন্দ করল। মন থেকে ভীষণ ভাবে চাইত আমরা তার কাছে থাকি। কিন্তু শেষবারও যখন কথা হয়েছিল সে বলেছিল, "আমার যদি কখনও কিছু হয়েও যায়, তোমরা কিন্তু পড়াশোনা ফেলে এখানে চলে এসো না।"
হ্যাঁ, এমনই ছিল মানুষটা। সবাই যখন বলে আমাকে নাকি অনেকটা বাবার মতো দেখতে, আমার bodylanguage নাকি অনেকাংশে বাবার মতো, তখন ভীষণ গর্ব হয়। সে মানুষটার মতো হওয়ার চেষ্টা করেছি সারাজীবন, তার মতো যদি সিকিভাগও হতে পারি, সেটা গর্বের তো বটেই। মানুষ হিসেবে এখনও বাবার তুলনায় অনেকটাই ছোটো আছি। প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে যাচ্ছি "বাবার মতো বড়" হওয়ার।

The Cricketer!

His luscious, unruffled jet black hair plummets onto the tips of his rectangular forehead. His tranquil eyes display the bright yet friendly touch of his personality. His skinny physique helps him defeat and conquer his cricketing dreams and goals. It's game day. The green grassy pitch stares into his gentle soul threatening him to do his best. His strong-will helps vanquish all his devilish threats. It's his time. Nothing can defeat him. He heavily inhales the oxygen, using his pointed curled nostrils. He admires his proud position, while consuming the knowledge given through his fellow teammates. Drips of sweat travel down his rounded, clear chin, chiseling past his figure. He's nervous. He rapidly strides to the pitch allowing his narrow, velvety lips to taste the emerged mist from the clouds, crawling through the limpid air.

The cricketer briskly lets out a roar, praising the gods above. His den was surrounded by spine-chilling lions, waiting to select the top team. A wave like electricity gushes through his compassionate figure. It's not going to be easy. His vigorous body overrides the frantic and negative pressure. "Hmph". A quirky laugh breaks through his perfectly chiseled lips. The first ball is bowled. A rounded object bolts towards him like a dart. The slightest lift of his bat triggers the ball, whisking it across the rigid ground.
"Four, it is a four, the first ball is a 4". The crowd leaps to their feet, full of excitement. The vicious lions have been impressed.

"Ahhh" I exclaim. The gloomy sun glares at me through the cotton like clouds. "Tick Tock Tick Tock" time expeditiously passes by, leaving us to crisp in the hot sun, but not for long. The Second Innings has begun. In my opinion, he was the best cricketer. But I know for sure he was the only picky cricketer I knew. " Could you please come and bowl to me!" The struggle of having to help him train annoyed me at a point of time. Well, now I know for sure it has paid off! Luckily I have grown to be a skinny cricket expert. Well, I believe I am! If only I could be like him! "Quiet down please" bawled the speaker seeking attention. The judges crawl down from their thrones. Their ground trembling eyes pursue only the greatest of them all. Now it's our time to wait.

- Malisha Ghosh

All for the very first time

-Shopan Dasgupta.

Memories… stay forever, especially childhood memories…

If I am to say that it was my first love, I wouldn't be lying. I was in fifth standard and the year was 1983.

My father was to write a book based on the work of Karl Marx the famous economist. He was on an assignment at Oxford University and London School of Economics. The assignment was for a 6 month's stay in England and he wrote to the University seeking permission for his family to accompany him.

It was Friday 15th April'1983 at about 02:45am my father, mother and myself are at the Indira Gandhi International Airport, Delhi. You would ask that if we were residing in Pune, then it would be easier for us to take the flight out of Mumbai (then Bombay) but due to formalities that were beyond my knowledge or experience in life we had to take the flight out of Delhi. It was a two -pronged process.

We had to go to the British Embassy in Mumbai as well as to the Passport Office in Mumbai and stand in long serpentine queue to get some official stamps, of which I had no prior knowledge in those days.

Returning to my story -after having gone through all the routine formalities at any International Airport, we waited in the Departure lounge for our bus that would ferry us to the aircraft that we were boarding. Bearing the weather in mind and the country to which we were heading my father brought me the first seriously expensive shoes at the time in those days. The brand was a North Star. It was a pair of good quality leather shoes that closely resembles todays shoes from the company 'Woodlands'. I had a gleeful smile as I wore them.

We boarded the bus an Apron Bus to be precise, and after a small drive on the Tarmac or Apron, the bus stopped just about 25 feet away from the aircraft. When the doors swung open and the aircraft became visible to me…I was completely mesmerised…gobsmacked.

It was 'HUGE…..A HUGE 'AIRCRAFT'. It was AIR INDIA and the aircraft was named as Emperor Vikram Aditya. Our return journey from London to Mumbai was on board Emperor Rajendra Chola. Air India then had its entire fleet of Boeing 747 dash 100's and 200's named after emperors and kings who ruled in Indian History. I was left speechless, simply looking at the size of the aircraft from the bottom step of the Passenger Boarding Stairs.

There it was, in true 'Maharaja' style…in all its glory and fine livery off the then Air India colours with four mounted Rolls Royce Engines and its blades turning in the wind… the APU and its noise. It is the auxiliary power unit which keeps the aircraft lights and aircon and other lights and switches operating when the aircraft is in parked mode….with Belt loaders in the rear aft off the aircraft and container loader on the front doing their job of loading cargo and luggage.

Along with the high lift truck from loading all the food and catering stuff. Every nuance of ground operations was on in full swing.

No other aircraft in the history of aviation has been more successful and important and a game changer as the Boeing 747 first introduced in the late 60's. The only other aircraft that was more successful was the Boeing 737 and its entire series of aircrafts as the small carrier. Boeing 747 was the first wide bodied aircraft and it made long distance travel a reality. In fact the first Boeing 747 was flown from Seattle on 30th September 1968. With a capacity of around 500 passengers, the capacity and operating costs of the 747 on long haul routes were better than any other aircraft then in service. It was popularly known as the 'Jumbo Jet'.

Over the years of various other experiences with the Boeing 747 I loved it for the spaciousness. I loved it for the walk-through galleys, I loved it for the innovative things you could try because there was so much space. Affectionately the pilots would refer to this aircraft as 'Daddy's Yacht'.I climbed up the stairs and into the aircraft through the rear door. The flight was supposed to depart at 02:45am, but in a few minutes times on completion of boarding there was an announcement by the captain…he stated that there was some technical problem that needed to be sorted and hence there would be a delay in taking off.

Finally, at 04:00am we took off from New Delhi heading towards our first transit stop Dubai. The one real disappointment that I had on this experience was that me, my father and mother were seated in the middle row of seats and so I was sans – a window. That was really big disappointment for me. We did ask the Cabin Crew if there was any possibility to switch seats, but Alas!! that did not happen. The flight was full.

After the flight took off and before we landed in Dubai the Cabin crew switched off the lights into night mode and most passengers fell asleep. At 07:30am we finally touched down in Dubai and as it was 1983 the airport at Dubai was not as modern as it was today. We were parked on the Apron and the stairways were attached for those passengers who deplaned at Dubai and for those who boarded to fly onto London. Dubai Airport did not look anything like it looks today. In comparison to today – I would call it a 'cow shed'.

At exactly 08:40am Dubai time the doors were locked and after engine start up we rolled down the taxi way for yet another take off…It was with great speed that we hurtled down the runway and soon we were at 25000 feet and climbing further to the cruise altitude. Flying in those days was sans modernisation in terms of passenger amenities and seats with their own in-flight entertainment and the whole shebang that we have these days.

After breakfast service – an announcement was made on the PA system which was something like this – Ladies and Gentlemen now we will be beginning our 'movie service' for this flight… the aircraft has been divided into 4 sections. I really don't remember which movies were being screened but I do remember that one particular section of the aircraft were being shown 'Star Wars – the return of the Jedi and another section a classic movie 'Come home Lassie'. I switched my seat with a fellow passenger who thought watching the Hindi movie 'Mausam' was a better option starring Sanjeev Kumar and Sharrmila Tagore.

On completion of the movie all passengers went back to their respective seats and we were served a sumptuous 'Air India Lunch' in its customary marron coloured catering accessories. The menu to my knowledge was Pulao rice with some chicken curry on one side and a vegetarian curry on the other. The crew kept serving us cold drinks and juice or alcohol beverages as per the passenger's request. It was a great experience being pampered at 38,000 feet….

In those days the first officer and the pilot would keep the passenger more informed about where they were flying with details like over which country at what speed and what was the outside temperature and what was the estimated time of arrival at Heathrow Airport. On completion of my lunch I asked my father to make a request to the chief of cabin staff – whether she could give me a tour of the aircraft, especially I was interested in viewing the cockpit.

In those day's there weren't that many FAA restrictions as such as 11th September 2011 was far away and yet to happen. The lady took me for a tour of the galleys inside the aircraft and then she took me upstairs and for that we had to climb the winding stairs.. on reaching upstairs it was made clear to me that those passengers were designated as 'first class'. Then came the most sterling moment of my flight when she knocked on the doors of the cockpit and showed me inside only to be greeted by the radio engineer and then the pilot and first officer. The cockpit of a Boeing 747-100 and 747-200 were full of gadgetry and instrumentation panels. It was nothing like the modern day cockpit. The whole stay inside the cockpit from start to finish would have been about 3 minutes but it felt as though I had spent half my flying time there inside THE COCKPIT.

Returned to my forsaken seat and slumped into it just think about everything that I had seen. I may have fallen asleep as a result as when I woke we had crossed several countries over Middle East and Europe and at around 03:00pm GMT the Pilot made an announcement that we were going to land and 'descent' would start soon…the continuous groaning off the engines suddenly reduced and I could actually feel that the aircraft had started to lose altitude. It was a magnificent 'touch down' by the pilot as we did not even feel much of a bump.

From the seat that I was sitting in I tried prying out off the adjacent row window seat to have my first glimpse of 'Heathrow International Airport'. Upon coming to a halt on the runway and taking a turn to go towards that gates the aircraft literally took about eight to ten minutes navigating through the taxi way and apron. On deplaning, I turned around and had another good look at the magnificent aircraft and this was my first day time viewing.

It was Spring time in London, but the temperature and the conditions were wintery as it was cold and rainy and it was 10degrees Centigrade. It was very cold.

As we made our thorough fare through the huge terminal building, I was simply stunned at the sheer size of the Airport and its operations. It was the first experience for me in my life. I had never seen something like this before. Even in terms of modernisation off the 80's – LHR was way ahead of its times. After finishing all customs formalities and collecting our luggage from the carousel we headed towards the intercity bus station at LHR. The bus station was simply magnificent. It had two level one above ground and one underground. All buses that arrived went underground and busses that were to depart left from above.

We took a bus from London Heathrow Airport to Paddington station as we were heading to Oxford. Entering Paddington Station was yet another milestone in terms of a memory of a life time. It felt as though I was at a movie set. It resembled like a scene from the great movie 'The great train robbery'. Its grandeur, its opulence, its architecture, the murals the paintings simply exotic and yet it retained its 'vintage look'. The trains off the 1980's, but compared to what we had back home in India, they were a sheer leap in faith.

The calculated distance from London to Oxford is equal to 6***1 miles*** or 98 ***km***. The train ride on board the Intercity from Paddington took exactly an hour at the average speed of 100kmph. The train ride also a first for me. The train ride was so smooth and time was off the essence.They ran to the dot. It also gave me the first insights into the city and rural life of Great Britain. The Engines were called Class 50's and they were diesel engines with around 10 long carriages that looked the modern part of the trains in the 1980's. The train started and rolled out off Paddington station and into the magnificent country side as it winded it up towards its destination and Oxford station was simply one of its halts.

Understandably we were very exhausted after a long day journeying right from India to London and now heading for our destination Oxford. We stayed the first night at a Bed and Breakfast just outside Oxford Station. To my recollection the name of the place was Porter House. Never in my life had I been in any B&B. Braving the cold my father and myself after having settled into our room, ventured out to buy some dinner for ourselves. We bought ourselves some take-aways for the night and went straight back into our room. We called it a 'DAY'.

The following day we were headed towards Oxford University and our final place of stay in a place known as Summertown. Summertown is about 3 kms. from where we had rested for the night. Early morning the landlady of the place knocked on our door and reminded us that breakfast was ready. It was a perfect 'English breakfast.' There was a small buffet that had been set. Eggs – fried, scrambled or poached. Fried or grilled bacon, bacon rashers, sausage, baked beans, toast, butter, jam and fruit juice. To me it was like a feast. I was eating as though there was no tomorrow. In terms of beverages there was English Tea and Coffee.

On completion of our breakfast, a car was sent to pick us up from the university, and it was tasked to drop us off at Summertown. This was like the staff and faculty quarters for all those who worked at Oxford University. It was a lovely place with lush green lawns and gardens. We then met with the Rector who was a fine elderly lady who talked with my father and then on completion of formalities handed us the keys to our place of residence, a place of residence for the next 6 months. Thus started our stay in Oxfordshire.

But to simply park the bus a little bit behind; that is when we threw the duvet covers over our heads and we switched off the room lights off the B&B room for our first night stay in England we finished one hectic kind of a day. We had travelled right from New Delhi to London and then to Oxford. All in a day. Another important thing that I believe happened in that whole experience was – 'it was a day of firsts'.

A day in my life when a lot of events took place, a lot of memories got etched into my mind – All for the Very First time. Throughout this stay of close to 6 months I had many a 'first time' in my life experience such as watching a match at Wimbledon Centre Court, watching the ICC World cup semi-final match between India and England, flying on board a DC 10, visiting the British Council library OR watching the Bond Movie – Octopussy or visiting the National Museum or as simple as getting to Britain's favourite snack food - 'FISH & CHIPS'.

Through-out all our lives we simply get past most days nonchalantly, but I don't think we stop for a while and say – "Oh! I think that was a first for me in my life today". In any case you all have done something for the first time today and that is when you have finished reading this for the very first time.

Dementia: we all need to know and talk more about it

-Dr Rita Krishnamurthy

Memory loss, forgetfulness, confusion…. many of us have experienced and wondered "I am going to get dementia?" What is dementia? Is it the same as Alzheimer's disease? Is it the same as memory loss in old age?

It is true that it is often hard to distinguish between age-related forgetfulness and early signs of dementia. Forgetfulness and confusion can happen under many circumstances; illness, trauma or grief, after major surgery etc. In many cases this condition is not permanent and people can revert to their normal state after recovering from the initial cause. However, some people will experience these symptoms (often known as cognitive decline) and then go on to develop dementia. In dementia the symptoms are more severe than those seen in normal aging, and there are often other accompanying symptoms.

So what is dementia? In clinical terms, dementia is characterised by deficiency in several functions including memory, reasoning, language, and the ability to perform everyday activities. The main cause (50 percent of cases) of dementia is Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is usually linked to genetic causes. Another common cause of dementia is stroke. When a stroke happens, blood supply to a part of the brain is lost. This may lead to dementia, depending on the region of the brain that is damaged. Vascular dementia is another type of dementia, associated with damage to blood vessels in the brain due to high blood pressure, diabetes, and damage related to drug and alcohol overuse. This type of dementia is potentially preventable. Treatment options depend on the individual diagnosis, and on the person's medical history and other co-existing conditions. For a proper diagnosis, a person has to be evaluated by a specialist psychiatrist using special tests.

Importantly, there is more and more evidence nowadays that many types of dementia can be prevented with a healthy lifestyle, in the same way that heart disease and stroke can be prevented. This is because a poor lifestyle – low levels of physical activity, unhealthy diet low in fresh fruits and vegetables, and high in salt, sugar and processed ingredients, as well as smoking, and heavy alcohol use can lead to high blood pressure, diabetes and other conditions. These conditions damage the blood vessels that supply blood to the brain, and therefore can cause dementia. Other ways to prevent or delay dementia is said to be having an active social life, such as participating in group activities, dancing, playing sports or doing other types of physical activity, and keeping the mind active by learning new things (such as learning to play a musical instrument, learning a new language, drawing or painting), doing puzzles etc.

There is a lot of stigma attached to any mental illness, including dementia. People are fearful of being diagnosed or of having a family member diagnosed with Alzheimer's disease or another type of dementia. This is perfectly understandable as there is very little known about it, it's not openly discussed, and it is seen as a terrible, incurable disease. While it is true that severe dementia is usually not reversible, there are some types of dementia where the symptoms may be reversed or at least reduced by addressing the cause. While there is no cure for dementia, there are medications and other types of treatments and care options available that may reduce the symptoms or help cope with them. Caregivers of people with dementia may also be eligible for support and help. Therefore, it is important to seek medical attention for yourself or your family member as early as possible.

There are several places where people can get help and information. Your GP can advise you of the best places to get further help and support. Other places to get information from are Dementia New Zealand (http://www.dementia.nz/) and http://www.alzheimers.org.nz and the New Zealand Ministry of Health (http://www.health.govt.nz/your-health/conditions-and-treatments/diseases-and-illnesses/dementia).

Disclaimer: the author is not a health professional, therefore this article is meant for general information only. Please seek the advice of your doctor if you have any concerns about your health or that of your family member.

Reference:

Whalley L J and Breitner J. Fast Facts: Dementia. 2nd Edition. Health Press Ltd 2009.

দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন

অমিত সেনগুপ্ত

ব্রহ্ম - এক ও অদ্বিতীয়। একথা স্বীকার করেও বহুকে মেনে নেওয়া যায়। বেদে এক ব্রহ্মের কথা আছে, আবার বেদেই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম, সূর্য্য ইত্যাদি বহু দেবতার স্তুতিও আছে। কারো কারো মতে তিন লোকের প্রত্যেক লোকে এগারো জন করে দেবতা আছেন। সেই হিসাবে ত্রিলোকের (স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল- এই তিনটি লোকের) দেবতার সংখ্যা মোট তেত্রিশ। আবার ঋগ্বেদে তিন হাজার তিনশ উনচল্লিশ জন দেবতার উল্লেখ আছে। এইভাবে ধীরে ধীরে দেবতার ক্রমবর্ধিত সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটীতে। বিশ্বভুবনকে ভাবা হয়েছে দেবতাময় রূপে। ভূলোক-দ্যুলোক-গোলোক সর্ব্বত্রই দেবতার পুণ্য অধিষ্ঠান। সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করতে যারা অভ্যস্ত, তাঁরা যে সর্ব্বত্রই দেবতার প্রকাশ উপলব্ধি করবেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য তাঁরা এও জানেন যে, এক ব্রহ্মশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ এই দেব ও দেবীগণ। এক পরমেশ্বরই বিভিন্নরূপে বিরাজমান। শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ছলে অর্জুনকে তাঁর অনন্ত রূপ ও অনন্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখালেন। শ্রীশ্রীচন্ডীতে শুম্ভাসুরের মোহ ভঙ্গ করে মা দূর্গা বললেন, "রে শুম্ভা, তুই বলছিস, আমি বহুর শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করছি? কিন্তু জগতে আমি তো একাই আছি, আর কে আছে? এই সব মাতৃকাশক্তি এক আমা হতেই উদ্‌ভুতা। সেই বহুশক্তিকে আত্মস্থ করে নিয়ে আমি একাই বিরাজিতা।" একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে একের এই সমন্বয় ভারতের প্রায় সব শাস্ত্রেই স্বীকৃতি পেয়েছে। যেমন বিশাল সমুদ্রের উপরিভাগে প্রবল স্রোতোবেগ ও উত্তাল তরঙ্গ বিদ্যমান, অথচ গভীর তলদেশে অসীম স্থৈর্য্য ও শান্ত গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, তেমনই একই ব্রহ্মের ভিতরে সগুণ-নির্গুণ, সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, সাকার-নিরাকার, দুই বিরুদ্ধ ভাবের কল্পনাও সম্ভব। একের মধ্যে বহুত্বের ভাবনার সূত্র এইখানেই। নিজ আনন্দ, নিজ খেলার জন্যেই এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষের বহুরূপে বিচিত্রলীলা। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিজের ঈশ্বরীয় ভাবে বহুমুখী শক্তির, বহুদেবতার সৃষ্টি ও রূপ নিয়েছেন। তিনিই আদি সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁরই দেহ ও মন থেকে বিশ্ব ও প্রজা সৃষ্টি হয়েছে। এই ভূমিকা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার। আবার, কেবলমাত্র এই সৃষ্টিতেই তো কাজ হবে না। পালন-পোষণের বা স্থিতিরও তো প্রয়োজন আছে। বিশ্বের পালক ও নিয়ন্ত্রক-রূপে যিনি প্রকটিত, তিনিই নাম পরিগ্রহ করেন বিষ্ণুরূপে। কিন্তু সৃষ্টি ও স্থিতির সাথে সাথে ঈশ্বরের আরও এক দায়িত্ব আছে। তা হোল বিনাশ। আজ যে জন্মাচ্ছে কাল সে মরছে। আর এই বিনাশের যিনি নাটের গুরু, তিনি হলেন সদাশিব মহেশ্বর। "সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ"- ঈশ্বরের এই তিন প্রকার কাজ বা দায়িত্ব, যথাক্রমে, ব্রহ্মা (সৃষ্টি), বিষ্ণু (স্থিতি), মহেশ্বর (বিনাশ) পালন করে থাকেন। আবার এনারাই (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ) একের মধ্যে বহুরূপে লীলারত। একই ব্যাক্তি যেমন তার স্ত্রীর স্বামী বা স্বামীর স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের বাবা অথবা মা, তার নিজের বাবা-মায়ের ছেলে বা মেয়ে,

বন্ধু-বান্ধবের বন্ধু, প্রতিবেশীদের প্রতিবেশী, দেশের নাগরিক, সাংসারিক ক্ষেত্রে জ্যাঠা-জেঠি, কাকা-কাকি, মামা-মামি, মেসো-মাসি, দাদা-দিদি, ভাইবোন, আরো কত কিছু –অথচ ব্যাক্তিটা একই। এক হয়েও কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ভুমিকাতে বিচরণ করতে হয়। ঠিক তেমনি, পরমেশ্বরও, একহয়ে তাঁরই রচিত এই বিচিত্র বিশ্বে নানা নামে, নানা রূপে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ ও লীলারত হন। তাই একের এই বহুত্ব কল্পনায় কোনও অসঙ্গতি বা দোষ নেই। তাই শুধু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের, এই তিন দেবতার উপাসনা করেই আর্য্য মনীষীরা ক্ষান্ত হন নি এবং তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। তাই তাঁদের মানসে ক্রমবর্ধিত দেবতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তেত্রিশ কোটীতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক ধারায়।

ভারতবর্ষের আর্য্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন ব্রহ্মৈকচিন্তা ও সাধনা, ঈশ্বর সাধনার সর্ব্বোত্তম অবস্থা হলেও, সেই উচ্চতর ভূমিতে মানুষ সহজে পৌছাতে পারে না। যে স্তরে সে এখন আছে, তাকে সে স্তরের উপযোগী করেই প্রাথমিক সাধনার পথ দেখাতে হবে। তার ধারণা-শক্তি ও যোগ্যতার ক্রম-পরিপুষ্টির সাথে সাথে সাধনার উপায় শিক্ষা দিলে তবেই তা সফল হয়। যে ছাত্রের সবেমাত্র হাতে খড়ি হয়েছে, তাকে এম এ ক্লাসের শিক্ষা দিলে সে কি তা বুঝতে পারবে? পারবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন অধ্যবসায়ের দ্বারা, ধাপে ধাপে উঠে, একদিন সেই সর্ব্বোচ্চ স্তরে সে নিশ্চই পৌছাতে পারবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চ সাধকের কথা বাদ দিলে, সাধারণ জনতা ধর্ম জগতে একান্তই শিশু। তাদের মেধা ও ধারণাশক্তিও অল্প; আগ্রহ ও ব্যাকুলতাও পর্য্যাপ্ত নয় এবং সাধনা শক্তিও ততটা উন্নত নয়। আর্য্য মনীষীদের লক্ষ্য ছিল সকল স্তরের, মানুষের মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্রত প্রচার ও প্রসার। মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল পরিস্কার ও গভীর। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, নাম ও রূপ ছাড়া সাধারণ মানুষ কোনও বস্তুরই ধারণা করতে পারবে না। কাজেই তাদের যদি উচ্চতর অধ্যাত্ম–তত্ত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হয়, তা হলে নাম ও রূপের কথাই আগে বলতে হবে। রূপের সাধনার মধ্যে দিয়েই অরূপের তত্ত্ব বুঝানো সহজ। পরম সত্যকে উপলব্ধির সোপান হিসাবে অরূপের এই রূপ কল্পনা। নাম ও রূপের পূজাকে কেউ ভ্রান্ত ও কুসস্কার বলতে পারেন, কিন্তু অপ্রয়োজনে এর উৎপত্তি ও প্রচার হয়নি। আসলে এ কল্পনা মানুষের নিজের সৃষ্টি নয়, এ কল্পনা ব্রহ্মের নিজেরই।

আজও ভগবান বা দেবদেবীর সম্বন্ধে মানুষের মনে নানা জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন আছে। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ-এর ধর্ম্মীয় আচার-প্রথা অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক ধারায় নানা দেবদেবীর পূজো আজও হয়ে আসছে।

এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে এমন কারোর পরিচয় হয়নি, যিনি ভগবানকে দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। ভগবানকে আমিও কখনও দেখিনি। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর বাহন, গরুড় ছাড়া আমরা প্রায় সকলেই তাঁদের (দেব-দেবীর) সমস্ত বাহনদের (গৃহ-পালিত এবং বন্যপশু-পাখি) দেখেছি এবং দেখতে পাই। প্রাণী-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা দেখতে/বুঝতে পারব যে, প্রত্যেকটি বাহনের আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট দেব-দেবীর স্বরূপ ও স্বভাব ধর্মের সাথে ঐক্য ও সমন্বয় আছে। আজ আমি সে আলোচনাই করবো। আমার আলোচ্য বিষয় হোলো "দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন"।

প্রত্যেক দেব-দেবীই এক বিশেষ শক্তি, তত্ত্ব ও ভাবের মূর্ত্তি। দেবতার মূর্ত্তি আমাদের সামনে বিরাজিত বা বিরাজিতা থাকেন। কিন্তু, তিনি (মূর্ত্তি) আমাদের সাথে কথাও বলেন না, প্রশ্নের উত্তরও দেননা। তাই দেবতত্ত্ব, দেবতারস্বরূপ, মহিমা ও প্রকৃতিই বা আমরা জানবো কেমন করে? আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক দেব-দেবীর এক-একটা বিশিষ্ট বাহন আছে। দেব-দেবীর সঙ্গে তাঁর, বাহনের কল্পনা বৈদিক কাল থেকেই চলে আসছে। যেমন ষষ্ঠীঠাকুরের বাহন বিড়াল, সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষীর বাহন পেঁচা, যমের বাহন মোষ, শিবের বাহন ষাঁড়, দূর্গার বাহন সিংহ। দেব-দেবীর সাথে এই বাহনের কল্পনা কেন? আসলে দেব-দেবীর বাহন, তাঁদের (দেব-দেবীর) রহস্যময় নিগূঢ়ভাব, শক্তি ও তত্ত্বেরই অন্যতম পরিবাহক রূপে বিরাজমান।

দেবতার মূর্ত্তি আমরা রচনা করি। তাতে আনুষ্ঠানিক প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও করা হয়। কিন্তু সত্যি-সত্যি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় কিনা আমি/আমরা জানিনা। অর্থাৎ দেব-দেবীর চৈতন্যসত্ত্বা আমাদের কাছে অধরাই থেকে যায় এবং তাঁরা (দেব-দেবীরা) আমাদের কাছে অপ্রতক্ষ্যই থেকে যান। দেব-দেবীরা অপ্রতক্ষ্য থাকলেও তাদের জীবন্ত (প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত) বাহনরা কিন্তু আমাদের আশে পাশে প্রায়ই ঘোরাফেরা করে অথবা চিড়িয়াখানায় (বা বনে জঙ্গলে) ঠাঁই পায়। তাদের অনেককে (গৃহ-পালিতদের) নিয়ে আমরা ঘরকন্নাও করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে তারা আমাদের সাহায্য করে। আমরাও তাদের অনেককে অপত্যস্নেহে ও ভালোবাসায় লালন-পালন করি। আমার বাড়িতেই ষষ্ঠীঠাকুরের তিনটে বাহন (বিড়াল) আছে। আবার অনেকের বাড়িতেই যমরাজের (বাহন নয়) প্রহরী, কুকুর পালিত হয়।

বাহন দেব-দেবীর পরিবহনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাঁরই বশীভূত হয়ে তাঁর আবশ্যকীয় সেবা করে। সেজন্যে কেবল বাইরের দিক থেকেই বিচার করেই নয়, ভিতরের দিক থেকে বিচার করলেও আমরা দেখতে পাব যে দেব-দেবীর ও তাঁদের বাহনের মধ্যে যৌক্তিকতা ও সমধর্মিতা আছে। এই বাহনদের আকৃতি-প্রকৃতি, হাব-ভাব, স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন এই সব আমাদের জানা। বাহনদের এই বিশিষ্টতার মধ্যেই দেব-দেবীরতত্ত্ব-সঙ্কেত লুকিয়ে আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে উপযুক্ত দেব-দেবীর সাথে উপযুক্ত বাহনের কল্পনা বা নির্বাচন যথোপযুক্ত হয়েছে। যে দেবতার সাথে যে বাহন মানায় বা যোগ্য, সেই দেবতার সাথে সেই বাহনেরই কল্পনা বা সংযোজনা করা হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে বিশ্বভূবনকে ভাবা হয়েছে দেবতাময় রূপে। এবং সেই হিসাবে ধীরে ধীরে দেব-দেবীর ক্রমবর্ধিত সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটীতে। তেত্রিশ কোটী দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন সম্বন্ধে লেখার সামর্থ্য আমার নেই এবং সে চেষ্টাও আমি করছি না। আমি কয়েকজন (আটজন) দেব-দেবী এবং তাঁদের বাহন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

ষষ্ঠী দেবী

দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই মা ষষ্ঠী ও তাঁর বাহন দিয়েই শুরু করবো। তার দুটো কারন আছে। প্রথম কারন, জন্মমাত্র সুতিকাগৃহেই আমরা বন্দনা করি মাতৃত্বশক্তির প্রতীক গৌরবর্ণা, নিত্যা, দ্বিভুজা, বরাভয়দায়িনী,

দিব্যবসন পরিহিতা, বামকোলে সন্তান ধারণ করে থাকা, বহু-সন্তানদায়িনী, প্রসন্নবদনা, বাৎসল্যময়ী ও মাতৃময়ী মা ষষ্ঠী ঠাকুরকে। জাতকের জন্মের ষষ্ঠ (ছয়) দিনে সূতিকাগৃহে এবং একুশ দিনে মা ষষ্ঠীর পূজা করা হয়।

গৌরবর্ণা বিশেষণটি সত্ত্বগুণের প্রকাশক। তাই বাৎসল্যের অধিদেবতা দেবী ষষ্ঠীও হয়েছেন গৌরবর্ণা। নিত্যা-বিশেষণটিও মাতৃশক্তির ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। কারণ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, আধি-ব্যাধিতে জীবনে-মরণে কোন অবস্থাতেই মাতৃস্নেহ লয়-ক্ষয় হয় না। সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা ও বাৎসল্য সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে থাকে। তাই মা ষষ্ঠীর ক্ষেত্রে বরাভয়দায়িনী বিশেষণটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। মা ষষ্ঠীই স্বর্গীয় মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। আদর্শ জননীর সদাচার ও পবিত্রতার উদাহরণ হিসাবে তিনি হয়েছেন দিব্যবসন পরিহিতা। (আমাদের গেরস্ত ঘরের মায়ের মতন তার বসন। নেই বিশেষ জাঁক-জমক।) প্রসন্নবদনা মায়ের মুখের একটুখানি হাসি সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়, সব দুর্ভাগ্য মোচন করে। তাঁর প্রসন্নতা সকল কল্যাণের হেতু। মোট কথা আমাদের গেরস্তের দৈনন্দিন জীবনের মাতৃত্বের সর্ব্ব-সুলক্ষণ সম্পন্না মায়ের যে রূপ হওয়া উচিত, মা ষষ্ঠীর কল্পিত রূপ ঠিক সেই মত। তিনি বাম কোলে সন্তান ধারণ করে আছেন (যা আর কোনও দেব-দেবীর কল্পনায় নেই)। মা ষষ্ঠীই মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীক।

মা ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল কেন?

বহু-সন্তানদায়িনী মা ষষ্ঠীর সাথে বিড়ালের বাহনত্বের কল্পনা, বিড়ালের প্রজনন শক্তির ও মাতৃত্বের স্বভাব থেকেই এসেছে। বিড়াল কেন মা ষষ্টির বাহন, এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুক্তি, মা বিড়ালের বাৎসল্য ও অপত্য স্নেহ-পরায়ণতা। নিজ সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ-মমতা পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই অল্প-বিস্তর থাকে। এটা জীবমাত্রেরই সহজাত ধর্ম। কিন্তু মা বিড়ালের অপত্য-স্নেহের কিছু বিশেষত্ব আছে। মা বিড়াল তার বাচ্চা-গুলোকে এমন স্নেহে-যত্নে, প্রেমে, বাৎসল্যে, মমতায় পালন করে যে, তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

সদ্যজাত বিড়াল ছানাগুলো মিউ-মিউ করে কাঁদে যেন ঠিক আঁতুর ঘরের নবজাত মানব শিশুর মত। বাচ্চা গুলোর কান্না শুনে মা বিড়াল দৌড়ে এসে তাদের স্তন্যদান ও স্নেহ দান করে আশ্বস্ত ও শান্ত করে। মা কাছে এলে ছানাগুলো উৎফুল্ল হয়ে কেউ বুকে, কেউ পিঠে, যে যেভাবে পারে মাকে ঘিরে ধরে। মা ও সন্তানের এতটা মাখা-মাখি মনুষ্য সমাজ ছাড়া (পশু-সমাজে) বিশেষ দেখা যায় না। বিড়াল দিনে ও রাতে সমদর্শী, মনুষ্য মাতার স্নেহদৃষ্টিও সেই ভাবেই জীবনের আলো ও অন্ধকারে সমানভাবে বর্ষিত। মনুষ্যশিশু মায়ের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। মা ঠিক যেভাবে রাখেন, সেভাবেই থাকে, যা খাওয়ান, তাই খায়, যা পরান, তাই পরে। তার নিজস্ব চেষ্টা বা অধ্যাবসায় কিছুই থাকে না। বাচ্চা অবস্থায় বিড়াল ছানা গুলোও ঠিক সেই রকম। মা বিড়াল মুখে করে তাদের যেখানে নিয়ে রাখে - উনুনের পাশে, ছাইয়ের গাদায়, কোনও গোপনীয় জায়গায় - তারা সেখানেই থাকে। নিজস্ব কোনও ইচ্ছা, চেষ্টা বা অধ্যাবসায় তাদের থাকে না। ওদিকে মা বাঁদর যখন নিজের বাচ্চাকে নিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দেয়, তখন বাদর-বাচ্চাটা তার মাকে জাপটে ধরে থাকে। এক্ষেত্রে বাচ্চা বাদরটারও কিছুটা চেষ্টা বা অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিড়ালের বেলায় সে বালাই নেই।

একটু বড় হলে মনুষ্য জননী বাচ্চাকে দাঁড়াতে, হাঁটতে, নিজ হাতে খেতে শেখান, স্বাবলম্বী হতে শেখান। ঠিক সেই রকম ভাবে, একটু বড় হলে বিড়াল মাও তার ছানাগুলোকে স্বাবলম্বী হবার জন্যে প্রথমে তার লেজ দুলিয়ে তাদের খেলতে শেখায়, এবং ধীরে ধীরে তাদের প্রকাশ্যে নিয়ে বেড়ায়, তাদের ভয় ভেঙ্গে দেয়। অবশেষে ছানাগুলো ইদুর-ব্যাঙ ইত্যাদি শিকার করতে শেখে। তাই মা বিড়াল অর্থাৎ বিড়ালীর বাৎসল্যের জোরেই (ছেলে) বিড়াল পেয়েছে মা ষষ্ঠীর চরণাশ্রয়। 'সতীর পুণ্যে পতির মুক্তি।'

ভগবানবিষ্ণু

ভগবান বিষ্ণু, আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরাধ্য ভগবান। তিনি "গরুত্মান", অর্থাৎ গরুড় যাঁর বাহন। তিনি নারায়ণ।

অনেক পণ্ডিতের মতে বিষ্ণু আসলে সূর্য্যেরই নামান্তর। বিষ্ণু ও সূর্য্য যে অভিন্ন, বেদেও তার উল্লেখ আছে। ভগবান বিষ্ণুকে আমরা জগৎ পালক বলে জানি। আবার আধুনিক বিজ্ঞান সূর্য্যকে পৃথিবীর পোষক-শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করে। বিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী; তিনি পীতাম্বর পরিহিত, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, কৌস্তভধর। তাঁর এই মূর্ত্তি কল্পনায় সূর্য্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য/গুণ লক্ষ্য করা যায়। সূর্য্য আকাশের বুকে দীপ্ত। আকাশ নীল এবং বিস্তারধর্মী। পীতবর্ণ (হলুদ বর্ণ) সূর্য্যের কিরণ, সমগ্র আকাশ এবং বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। আকাশ, সূর্য্য এবং সূর্যের দীপ্তি—এই তিনটে বস্তুকে একত্রিত করলে তা ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তির সঙ্গে সহজেই মিলে যায়। আকাশ বিস্তারধর্মী, বিষ্ণুও সর্ব্বব্যাপক; আকাশ নীলবর্ণ, বিষ্ণুও নীলবর্ণ; আকাশ বিশ্বভূবন আচ্ছাদনকারী, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সূর্য্যের কিরণরাশি পীতাভ (হলুদ রঙের), বিষ্ণুরও পীতাম্বর বেশ। আকাশের বিস্তার বিষ্ণুর সর্ব্ব-ব্যাপতার প্রতীক। ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, বিভু—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও স্থান বা বস্তু নেই যেখানে বিষ্ণুর সত্তা নেই। যেমন সমগ্র পৃথিবীরও এমন কোনও জায়গা/স্থান নেই যেখানে সূর্য্য-কিরণ পৌছায় না। তাই ভগবান বিষ্ণু আমাদের অদৃশ্য দেবতা নন, সূর্য্যমণ্ডলের আসনে সূর্য্য বর্ষচক্রের নিয়ামক, বিষ্ণুও চক্রপাণি। তিনি নিত্য বিরাজমান। প্রতিদিনই আমরা তাঁর দিব্য দর্শন লাভ করতে পারি।

সূর্য্য নারায়ণ

বিষ্ণুই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্ত্তা। রজোগুণ অবলম্বন করে যখন তিনি সৃষ্টি করেন, তখন তিনিই ব্রহ্মা। তিনিই যখন সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে পালন কার্য্য করেন, তখন তিনি বিষ্ণু। আবার তিনি যখন তমোগুণ অবলম্বন করে রুদ্ররূপে বিনাশ কার্য্য করে থাকেন, তখন তিনিই শিবঠাকুর/মহেশ্বর। ভগবান বিষ্ণুই সকল তত্ত্বের রাজা। এই তিনটিই তাঁর সগুণ- রূপ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে সূর্য্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সূর্য্যই বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ, সূর্য্যই এই বিশ্বের পালন-কর্ত্তা এবং বিনাশ-কর্ত্তা।

আগেই বলেছি যে এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে এমন কারোর পরিচয় হয়নি, যিনি ভগবানকে দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। ভগবানকে আমিও কখনও দেখিনি। বিষ্ণুকে যদি সূর্য্য হিসাবে কল্পনা করা বা ভাবা হয়, তা হলে তো বলা যায়, যে ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান (বা দেবতা), যাঁর দর্শন আমরা রোজই পেয়ে থাকি। আবার ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান (বা দেবতা) যাঁর বাহন কে আমরা, (at least আমি) কখনও দেখিনি। অথচ অন্যান্য দেব-দেবীর দর্শন না পেয়েও তাঁদের বাহনদের আমরা প্রায় সবাই দেখেছি। যেখানে ভগবানের দর্শন, সেখানে বাহনের দর্শন নেই, আর যেখানে বাহনদের দর্শন সেখানে ভগবানের (দেবদেবীর) দর্শন নেই।

গরুড় কেন ভগবান বিষ্ণুর বাহন?

আগেই বলেছি যে, গরুড় নামে কোনও পশু বা পাখি আমি কখনও দেখিনি। আর আমি এমন কাউকে জানিনা যিনি গরুড়কে দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও কোনও আলোচনা বা যুক্তি এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাকে পুরাণের সাহায্য নিতে হবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, বেদ-পুরাণে ভগবান বিষ্ণুকে বলা হয়েছে "গরুত্মান"। অর্থাৎ গরুড় যাঁর বাহন। বেদ-পুরাণে উল্লিখিত আছে বিষ্ণু-বাহন গরুড়ের বলবীর্য্যের কথা। গরুড় অপরাজেয়। নিজ মাতা বিনতাকে দাসবৃত্তি থেকে উদ্ধারের জন্যে গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃত এনেছিলেন। তখন গরুড়ের সঙ্গে সসৈন্য দেবরাজ ইন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ হয়। তখন ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবতারা বিজয়ী হতে পারেন নি। নিরুপায় ইন্দ্র তখন নিক্ষেপ করেন তাঁর বজ্র। মহাবীর গরুড় বজ্রের সম্মান রক্ষার জন্যে হাসি মুখে তাঁর একটি মাত্র পালক বিসর্জন দিলেন।

শক্তি ও ভক্তি দুই দিক দিয়েই গরুড়ের চরিত্র দুর্লভ। তিনি ছিলেন মাতৃভক্তির দুর্লভ উদাহরণ। নির্লোভতার দিক দিয়েও তাঁর চরিত্র অনুপম। নিজ বল-বিক্রমে অমৃত-পাত্র হস্তগত হয়েছে, তবুও অমৃতে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ বা আসক্তি নেই। গরুড়ের এই গুণাবলী ভগবান বিষ্ণুকে আকৃষ্ট করে। তিনি চাইলেন বর দিতে। গরুড় চাইলেন অমৃত পান ছাড়াই অমর হতে এবং সর্ব্বদা ভগবান বিষ্ণুর চরণে আশ্রয়/ঠাঁই পেতে। সেই থেকে গরুড় হলেন ভগবান বিষ্ণুর বাহন।

মা লক্ষ্মী

বালসূর্য্যের মত জ্যোতি যাঁর, ইন্দুখন্ড দ্বারা শোভিত, বিবিধ রত্নে বিভূষিতা, শালিধানের মঞ্জরী, পদ্ম ও কৌস্তভমণি যিনি সর্ব্বদা ধারণ করে থাকেন, পদ্মের মত ত্রিনয়ন যাঁর, বাণিজ্যরূপা, বিষ্ণুপত্নী, ভূলীলা, নিত্যা, সুখপ্রদা পরমা-সুন্দরী ও পরমার্থময়ী, হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, বিশালাকায় চার হাতি গঙ্গাজল দিয়ে নিত্য যাঁর অভিষেক করে, তিনিই মা লক্ষ্মী। গৃহে তিনিই গৃহলক্ষ্মী। বণিকদের বাণিজ্য-রূপিণী। তিনি সর্ব্বশস্যাত্মিকা অর্থাৎ সর্ব্ব শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সর্বভূতের জীবিকার উৎস। তিনি ধনদেবী। এই রূপেই আমরা তাঁর আরাধনা করি।

লক্ষ্মী সমুদ্র-তনয়া, দেবাসুরের সম্মিলিত মন্থনপ্রচেষ্টা হতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব কালে সমুদ্রগর্ভ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন ও অমৃত উত্থিত হয়েছিল। তাই তিনি ধন-ঐশর্য্য প্রাপ্তির দেবী।

প্যাঁচা কেন লক্ষীর বাহন?

খুবই অবাক হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রী, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যের অধিদেবতা পরমা-সুন্দরী মা লক্ষীর বাহন -- কদাকার, দিনান্ধ, কর্কশ-কন্ঠ, হিংস্র-স্বভাব –- প্যাঁচা। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মা লক্ষীর সবই ভালো, কেবল মাত্র বাহন নির্বাচনই যথোপোযুক্ত হয় নি। সংসারে এত সুন্দর সুন্দর পশু-পাখি থাকতে তিনি প্যাঁচাকে কেন তাঁর বাহনত্ব দিলেন? আসলে মা লক্ষীর সঙ্গে প্যাঁচার সম্মেলন সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সর্ব্ব প্রকার শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বাহন প্যাঁচা ধানের শত্রু ইঁদুর-কুলের সংহার করে শস্য বা ধান রক্ষার ব্রত পালন করছে। দিনের বেলায় প্যাঁচা গো-বেচারা, গাছের কোটরে আত্মগোপন করে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে সে দুর্ধর্ষ। বিদ্যুৎ বেগে উড়ে গেলেও তার পাখার কোনও শব্দ হয় না। তাই অতর্কিতে আক্রমণে সে অনায়াসেই সাফল্য অর্জ্জনে সমর্থ। প্যাঁচা যম রাজের দূত। যমই ধর্ম, যমই সংযম। ধনদেবী লক্ষীও ধনোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে মানুষের মনে সংযম-বুদ্ধি ও ধর্ম্মীয়-চেতনা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি যেন বলেছেন, তাঁর বাহন প্যাঁচা যেমন দিনে অন্ধ, আমার ভক্তরাও যেন তেমনি পরধন সম্বন্ধে অন্ধ হয়। অসৎ উপায়ে উপার্জনের পথে যেওনা। দুর্নীতির পথে যেওনা, সে পথে গেলে যমরাজের দণ্ড আছে, যমের দূত প্যাঁচাকে দেখে তা স্মরণ করো। ধনোপার্জ্জন করতে হবে ঠিক, কিন্তু তা করতে হবে সৎ ও ধর্মীয় উপায়ে। ধনোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ ধন হোল মুক্তিধন। মৃত্যুচিন্তা এই মুক্তিধন প্রাপ্তির প্রধান সহায়ক। যারা মৃত্যুচিন্তা করেন, তাঁরা মায়ামোহে আকৃষ্ট হন না, পার্থিব ধন-জনের প্রতি দুর্নিবার আসক্তি থেকে মুক্ত হন। যমদূত প্যাঁচা তার প্রভুর দৌত্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই মৃত্যুচিন্তা ও আত্মচিন্তার উদ্দীপনা মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে। মৃত্যুচিন্তা ও আত্মচিন্তার দ্বারা আত্মিক দৈন্য ঘুচে যায়। যা ঘুচাতে প্যাঁচার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং প্যাঁচার, মা লক্ষীর বাহনত্ব পাওয়া যুক্তি-সঙ্গতই হয়েছে।

শিবঠাকুর

মহাদেব শিব, মহাযোগী শিব, সংহারকারী শিব, পরম-মঙ্গলময় শিব, জগতের আদিকারণ শিব এবং বিশ্ব-প্রতিপালক শিব। এই হোল শিবঠাকুরের প্রকৃত পরিচয়। অনেকে বলেন মহাদেব শিব প্রথমে অনার্য্যগণ দ্বারা পুজিত হতেন। তাই বৈদিক যাগযজ্ঞে শিবঠাকুরের স্থান ছিলনা। দক্ষ সেই কারণেই তাঁর যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। দক্ষযজ্ঞ লন্ডভন্ড হবার পরই শিবঠাকুর যাগযজ্ঞের অন্যতম দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। যদিও শিবপুরাণ মহাদেব শিবকে বৈদিক দেবতারূপেই স্বীকৃতি দিয়েছে, এই পুরাণ অনুযায়ী তিনি ভক্ত কল্যাণকারী সাক্ষাৎ শিব।

তিনি সকল জীবের প্রভু, তাই তাঁর আর এক নাম ঈশান; তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তাই তিনি মহেশ্বর, তিনি দেবগণবন্দিত, তাই তিনি মহাদেব, তিনি পশু বা জীবগণের নাথ বা পতি, তাই তিনি পশুপতি। তিনি সোমনাথ, বিশ্বেশর, পরমেশ্বর, কেদারনাথ, শঙ্কর, নাগেশ্বর, বৈদ্যনাথ, আশুতোষ, নীলকন্ঠ, উমাপতি, উষাপতি, রূদ্র, সদাশিব, ত্রিশূলপাণি, ভূতনাথ, নটরাজ, ধূর্জ্জটী, ত্রিপুরারি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিরাজিত। শিবের অধিষ্ঠানভূমিকে শিবলোক বলা হয়। তিনি ত্যাগীর আদর্শ, তিনি গৃহীরও আদর্শ। আবার তিনিই যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানীরও আদর্শ।

দক্ষযজ্ঞের তাণ্ডবের ঘটনা অধিকাংশ পাঠকের জানা, তাই এই লেখায় তার উল্লেখ করছি না।

দক্ষযজ্ঞে শিব-পত্নী সতী মৃতা। শিব ক্রোধিত। এই সঙ্কটকালে তাঁকে শান্ত করা কঠিন ও প্রয়োজন। তা না হলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধংস হয়ে যাবে। অবশেষে ভগবান বিষ্ণুর প্রচেষ্টায় তিনি শান্ত হলেন। ত্যাগীবীর মহাদেব শিবের শান্ত হওয়ার কারণ ছিল জনস্বার্থ। শিব ও সতী ছিলেন অভিন্ন হৃদয়। দক্ষযজ্ঞে মৃতা সতীর আজ পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। তা না হলে মঙ্গলময় শিবের সান্ত্বনা কি ভাবে সম্ভব? স্বয়ং বিষ্ণু এগিয়ে আসেন। ধর্মের রহস্য তিনি অবগত। আপন সুদর্শন চক্র দিয়ে শিবের কাধে শায়িত সতীর দেহটি একান্ন অংশে ছিন্ন করে একান্নটি স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। সেই একান্নটি স্থান পরিণত হয় একান্নটি পীঠস্থানে/তীর্থস্থানে। দক্ষযজ্ঞে শিব-সতীর স্থান হয়নি। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু শিব-সতীর মহিমা বিশ্বময় (একান্নটি স্থানে) ছড়িয়ে দিলেন। দক্ষযজ্ঞে ধর্ম ও মঙ্গলের লাঞ্ছনা হয়েছিল। বিনিময়ে বিশ্বময় ধর্ম প্রচারের একান্নটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই মহান আয়োজন দেখেই মঙ্গলময় শিব হন, শান্ত ও প্রকৃতিস্থ।

দেবাসুরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমুদ্রমন্থনের সময় নাগরাজ বাসুকি হয়েছিলেন মন্থনরজ্জু। তাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত বাসুকি তাঁর গরল/বিষ উদ্গার করতে থাকেন। সেই বিষের তেজে সমগ্র পৃথবী দগ্ধপ্রায়। নিরুপায় ভীত-সন্ত্রস্ত দেবাসুর, আত্মভোলা শিবের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ শিবকে বললেন, "হে মহেশ! আপনিই দেবগণের অগ্রগন্য। কাজেই সমুদ্রমন্থনে আগে যা উঠেছে, তা আপনি ছাড়া আর কে গ্রহণ করবে?" নারায়ণের অনুরোধে এবং দেবাসুরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখে দেবাদিদেব মহাদেব বিনা বাক্যব্যায়ে নিজে বিষ পান করে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। তখনই তিনি হলেন নীলকণ্ঠ।

ষাঁড় কেন শিব ঠাকুরের বাহন?

শিব ঠাকুরের সৌম্য ও রুদ্র, এই দুই ভাবের প্রকাশই ষাঁড়ের (বৃষভের) মধ্যে বিদ্যমান। (বৃষভ শব্দের অর্থ বলবান।) ক্রোধিত অবস্থায় ষাঁড় ভীষণ বীর্যবান, দুর্ধর্ষ, সংহারমূর্তি; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সে শান্ত, নিরীহ, অনুগত, লোক-হিতকারী, কৃষি ও পরিবহনের কাজে সহায়ক। কৃষি, পরিবহন ইত্যাদি কাজে ষাঁড়

যেমন মানুষের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তেমনি প্রজননের প্রয়োজনেও অনেক গরুর কামনা পুরনে সমর্থ। শিব রাত্রির রাতে অনেকেই সন্তান কামনায়, শিবের পূজো করে থাকেন। আশুতোষ শিবও ভক্তদের কামনা পুরণে সদা উন্মুখ। ভক্তের মঙ্গল বিধানে তিনি কামবর্ষী। সেই হিসাবে ষাঁড় শিব ঠাকুরের সার্থক বাহন।

মা দুর্গা

দূর্গতি নাশ করেন যিনি তিনিই দূর্গা। দুর্গা শব্দটি অতি প্রাচীন। "দ" শব্দটির মানে "দৈত্যনাশক", "উ"-কার মানে বিঘ্ন-নাশক, "রেফ" মানে রোগ-নাশক, "গ" মানে পাপ-নাশক, এবং "আ"কার মানে ভয়-নাশক ও শত্রু-নাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। মা দুর্গা - দূর্গতিনাশিনী, কেশরাশিসমাযুক্তা, ত্রিনয়নী, মহিষাসুরমর্দিনী, অষ্টশক্তি পরিবেষ্টিতা, সর্ব্বাত্মিকা, সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা, সর্ব্বব্যাপিনী, রুদ্ররূপী, নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরী, ইষ্টফলদাত্রী, সর্ব্বদর্শিনী, সর্ব্বদেহে বিরাজিতা, জীবনশক্তি-রূপিনী, সিদ্ধি-প্রদায়িনী, অভীষ্ট-প্রদায়িনী, অভয়া, জগৎব্যাপী, দশভূজা, দশপ্রহরণী, মহামায়া, কল্যাণী। দেবজগতে যত নারীমূর্ত্তি আছেন, তা মা দুর্গারই বিগ্রহ।

মা দুর্গার সাথে মহিষাসুরের সংগ্রাম - দৈবী ভাবের সাথে আসুরিকতার সংগ্রাম। দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে মানুষের জীবনে অবিরত। এ সংগ্রামে জয়লাভ করেই মানুষকে আত্মমুক্তির অধিকারী হতে হয়। এই সংগ্রামের দুইটি দিক আছে। একদিকে রজঃ ও তমোগুণ-জাত দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, অজ্ঞান ইত্যাদি; আর অন্যদিকে আছে সত্ত্বগুণ-জাত তপঃ, স্বাধ্যায়, দান, শৌচ, ত্যাগ, সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, সারল্য, অদম্ভ ইত্যাদি। প্রথমটি আসুরিক ও দ্বিতীয়টি দৈবিক। সর্ব্বদৈবিক শক্তির সমন্বয়েই হয়েছিল মহামায়ার আবির্ভাব। সর্ব্বদৈবিক শক্তির সমন্বয়রূপা দেবী দুর্গার হাতেই মহিষাসুরের পরাজয় ও নিধন হয়েছিল। কাজেই আমরা যদি আমাদের অন্তরের সুপ্ত দৈব ভাব ও দৈব গুণ গুলিকে জাগ্রত ও সংগ্রামমুখী করতে পারি, তাহলে আমাদের আসুরিক ও পাশবিক বৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সেই বৃত্তিগুলোকে পরাভূত করতে পারি। এ সংগ্রাম সহজ নয়। নিরস্ত্রভাবে এই সংগ্রাম চলে না। দেবী দশপ্রহরণী। তাঁর হাতে রয়েছে, দশপ্রহরণ। কিন্তু আমাদের হাতে প্রহরণ বা অস্ত্র কোথায়? আমাদের অস্ত্র বা প্রহরণ হোক আমাদের বিবেক-বৈরাগ্য। এই বিবেক-বৈরাগ্যকে প্রহরণ/অস্ত্র করেই আমাদের আসুরিক ও পাশবিক বৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সেই বৃত্তিগুলোকে পরাভূত করতে হবে। এই সংগ্রামে চাই চারিত্রিক ও আত্মিক ঐশ্বর্য্য। তাই দেবীর দক্ষিণে মা লক্ষী হয়েছেন তাঁর সহচরী। এই সংগ্রামে বিঘ্নও আছে। তাই বিঘ্নেশ গনেশও দেবীর (আরোও) দক্ষিণে বিরাজমান। এই সংগ্রামে চাই উত্তম মেধা, ধীশক্তি ও সাধ্যায়। মেধা, বাক ও জ্যোতিরূপিনী মা সরস্বতী হয়েছেন দেবীর বামসহচরী। কৌমার্য্য বা ব্রহ্মচর্য্যের প্রতীক কার্ত্তিক হয়েছেন দেবীর আরও বামদিকে বিরাজমান। এই সমষ্টিগত সাহচর্য্যের দ্বারা আমাদের আসুরিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

<u>সিংহ কেন মা দুর্গার বাহন</u>?

সিংহ হোল রজোগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণময়ী মাদুর্গা নিয়ন্ত্রিত

করছেন রজোগুণের দ্যোতক সিংহকে, সিংহ আবার শাসন করছে তমোগুণাত্মক মহিষকে। মাদুর্গার কয়েকটি লক্ষণের সাথে মহাবল সিংহের মিল আছে। দেবীদুর্গা বিশ্ব-রাষ্ট্রের সম্রাজ্ঞী; সিংহও রাজলক্ষণ-যুক্ত পশুরাজ। মাদুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী; দাঁত আর নখই সিংহের সহজাত অস্ত্র। দেবী জটাজুট-সমাযুক্তা; সিংহও কেশরী। দেবী মহিষাসুর মর্দিনী; মহিষের সাথে যুদ্ধে সিংহই যোগ্যতম যোদ্ধা। সিংহের থাবায় এত শক্তি যে তার এক থাবার আঘাতে বড় বড় মহিষের মাথার খুলি চুর্ণ হয়ে যায়। সিংহ মহাবীর্যবান পশু। আগেই বলেছি যে সিংহ রজোগুণের প্রতীক। রজোগুণের মধ্যে রয়েছে এক দুর্দ্দমনীয় শক্তির প্রচণ্ড উচ্ছাস। এই রজোগুণের শক্তি তমোগুণের সাথে মিলিত হলে জগতে আসে ঘোর অকল্যাণ। আর রজোগুণ সত্ত্বগুণের অনুগত হলে সেই মিলিত শক্তি লোকহিতকর হয়, তাতে লোকরক্ষা হয়। লোকহিত ও লোকরক্ষার জন্যেই তো মা দুর্গা যুগে যুগে অবতরণ করেন। তাই লোকহিত ও শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে, সিংহই মহাশক্তিময়ী দেবীর বাহন হওয়ার যোগ্যতম জীব।

গণেশ

গণেশ, সনাতন ধর্মের পৌরাণিক দেবতা। হাতির মতো মাথা থাকায় এই দেবতাকে সহজেই চেনা যায়। তিনি এক দন্ত। এঁর গায়ের রঙ লাল। এঁর চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। গণেশের বাহন –ইঁদুর। গণেশ সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্ননাশক হিসাবে সর্বাধিক পূজিত। গণ+ঈশ=গণেশ, গণ মানে সমষ্টি। সমষ্টির যিনি ঈশ্বর বা নায়ক তিনিই গণেশ। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে– ইনি সকল কর্ম-সম্পাদন করার এবং যে কোনও দেবতার পূজার আগে ইনি পূজিত হন। তাই কোনও কিছুর উদ্বোধনকে শ্রীগণেশও বলা হয়ে থাকে। গণেশের জন্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী অনেক কাহিনি শোনা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। এই সব বিরুদ্ধ কাহিনীর ভিতরে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে গণেশের জন্ম বিষ্ণুর বরে এবং বিষ্ণুর অংশে। তাই বিষ্ণুর মতই গণেশ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

হর-পার্বতীর বিয়ে হয়েছে বহুকাল হয়ে গেল, কিন্তু কোনও সন্তান

হোল না। যিনি বিশ্বজননী তাঁরই সন্তান হয় নি। এ দুঃখ অসহনীয়।

শিব পার্বতীকে বললেন মাতৃত্ব লাভের জন্যে বিষ্ণুর তপস্যা করতে। পার্বতী শুরু করলেন বিষ্ণুর তপস্যা। দেবীর আরাধনায় তুষ্ট বিষ্ণু, জগদম্বার মাতৃত্বের পিপাসার নিবৃত্তি সাধনের জন্যে আপন অংশভূত সুসন্তান দানের উদ্দেশ্যে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শিবধামে এলেন এবং পার্বতীর পূজা গ্রহণ করলেন। তারপরেই সেই ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু হলেন অন্তর্হিত। দৈববাণী হোল—"যাও শয়নকক্ষে গিয়ে দেখ, তোমার বাঞ্ছিত কুমার তোমার ঘরে এসেছেন।" দেবী ছুটে গিয়ে দেখেন দৈববাণী সত্য। হর-পার্বতীর শয়নকক্ষে এক সদ্যজাত কুমার সানন্দে ক্রীড়োন্মত্ত।

বামন পূরাণের মতে মহাদেব-পার্বতীর বিয়ের পরে পার্বতী নিজের দেহমল থেকে পীনবক্ষা, সর্ব্ব-সুলক্ষণ, চতুর্ভুজ ও গজানন এক পুত্রের সৃষ্টি করেন, তিনিই গণেশ। নায়ক ব্যাতিতই তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তিনি বিনায়ক।

আর বরাহ পুরাণের মতে, গণেশের জন্ম মহাদেবের শ্রীমুখ হতে। এক সময় মহাদের চিন্তা করতে করতে হঠাৎ অট্টহাসি হেসে ওঠেন। সেই অট্টহাসি থেকে আবির্ভূত হন গজানন গণেশ।

গণেশ কেন গজানন?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা স্কন্ধচ্যুত হলে, শ্রীবিষ্ণু পুষ্পভদ্রা নদীর তীরের অবস্থিত এক গজের/হাতির মাথা সুদর্শন চক্র দিয়ে ছিন্ন করে গনেশের গলায় লাগিয়ে দেন। শ্রীবিষ্ণুর বরে হয়েছিল গণেশের জন্ম, এ সঙ্কটে তিনিই আবার হন গণেশের রক্ষক। গণেশের গজানন সম্বন্ধীয় আরও অনেক কাহিনি বা মতামত প্রচলিত আছে। সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করছি না।

গণেশ একদন্ত কি ভাবে হলেন?

ক্ষত্রিয়কূলনাশক পরশুরামের সাথে যুদ্ধে গণেশ একদন্ত হয়েছিলেন। শিব ঠাকুরের দর্শনের জন্যে পরশুরাম উপস্থিত হলেন কৈলাসে। শিব ঠাকুর তখন নিদ্রামগ্ন। দাররক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন গণেশ। তাঁর উপর আদেশ, বিনা অনুমতিতে কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। এদিকে পরশুরামও নাছোড়। গণেশ বাধা দেওয়ায়, লেগে যায় তুমুল যুদ্ধ। তাতেই গণেশের একটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। সেই থেকে গণেশ একদন্ত হন।

গণেশ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী। মহাভারত রচনার তিনিই ছিলেন লিপিকার (Stenographer)। ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনার সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি "লিপিকার কে হবেন"---এই বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর উক্তি নির্ভুলভাবে দ্রুত লেখবার মত যোগ্য আধার কে? এ কাজ তো সাধারন পড়ুয়া পন্ডিতের সাধ্যায়ত্ত নয়। চাই—মরমী রসজ্ঞ, চাই শ্রুতিধর, চাই প্রজ্ঞানী, চাই অনন্য-চিত্ত পরম যোগী, যিনি হবেন ক্লান্তিহীন, উন্মুখ ও সদা সাবধান। এই সব প্রশ্ন নিয়ে ব্যাসদেব ব্রহ্মার শ্মরনাপন্ন হন। ব্রহ্মা বললেন, গণেশের শরণাপন্ন হতে। গণেশ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কিন্তু লেখনী সঞ্চালনেও তিনি (বিদ্যাদেবী মা সরস্বতীর ভাই) কম যান না। মহাকবি ব্যাসদেবের কথায় গণেশ রাজি হয়ে গেলেন। এইভাবে গণেশ হন মহাভারতের লিপিকার।

ইঁদুর কেন গণেশের বাহন?

আমদের জীবনে পদে পদে বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি। গণেশ বিঘ্নেশ। বিঘ্ননাশক। গণেশের সঙ্গে তাঁর বাহন ইঁদুরের চরিত্র বৈশিষ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। ইঁদুর, ছোট্টো প্রাণী, তার দাঁতগুলো আরও ছোট। অথচ পর্ব্বতের কঠিন শিলা-রাশিকে সে বিদীর্ণ করতে পারে। এই, কাজটা এক দিনে হয় না। সেটা হয় কঠোর শ্রম, অটুট ধৈর্য্য এবং অক্লান্ত অধ্যাবসায়ের সাথে, অনেক দিনের চেষ্টায়। ইঁদুরের মাড়ীতে দুটো করে ছেদন দাঁত আছে। এই ছেদন দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হবার পরেও আবার বাড়ে। এজন্যে কঠিন পাষাণও ইদুরের কাছে পরাভুত হয়। আমরা জানি গণেশের জ্ঞানময় স্বরূপের কথা। সে জ্ঞান লাভ করতে হলে অবিদ্যার অষ্টপাশ মোচন করতে হয়। জীব অষ্টপাশে বদ্ধ। ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, বৈগুণ্য এই কয়টিই হোল অষ্টপাশ, মায়ার বন্ধনপাশ। এই মায়াবন্ধন কাটতে হবে। তা হলেই হবে মুক্তি। গণেশের ভিতর এই এই অষ্টপাশ ছেদনের ভাবটি অন্তর্নিহিত। কঠিন পাশ, বাধা-বিঘ্ন তিনি এক মুহূর্তে কেটে দিতে পারেন। মানুষকে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই তিনি বাহন পদে বরণ/গ্রহণ করেছেন তীক্ষ্ণদন্ত ইঁদুরকে।

মা সরস্বতী

দেবী সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী, সর্ব্বশুক্লা, বাগ্‌দেবী, নিষ্কলা, নিত্যশুদ্ধা, বুদ্ধিদায়িনী ও মোক্ষদায়ী। তাঁর হাতে লেখনী, পুস্তক ও বীণা, তিনি শ্বেতপদ্মসনা, তিনিই বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্তাদি বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেবী, তিনি সকল তমঃ নাশ করেন, তিনি সকল ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধিদায়িনী, হংসরূঢ়া।

যোগীর হৃদয়ের আলোকবর্ত্তিকা যখন জ্বলে ওঠে তখন সকল অজ্ঞানের তিমিরাবরণ খসে গিয়ে সমুদয় সত্তা হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়; কেবল আলো আর আলো। এই জ্যোতির জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, এই জ্যোতিই আলোকময়ী সরস্বতী। বেদে সরস্বতী সম্বন্ধে তিনটি সার্থক সম্বোধন রয়েছে। কোথাও তাকে বলা হয়েছে "দেবীতমা", কোথাও বলা হয়েছে "অম্বিতমা", আবার কোথাও বা বলা হয়েছে "নদীতমা"। দেবীতমার মানে "দেবীশ্রেষ্ঠা", অম্বিতমার মানে "মাতৃশ্রেষ্ঠা" এবং নদীতমা মানে "নদীশ্রেষ্ঠা"। তিনি দেবী, তিনি মা, তিনি নদীরূপা। সকল দ্যোতনশীল বস্তুর মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠা,

ইনি দেবীতমা; জননীর মত আমাদের মুক-কন্ঠে ভাষা ফুটিয়ে তোলেন, তাই তিনি অম্বিতমা; সন্তানের প্রতি বিগলিত বাৎসল্যে ইনিই স্থুল-সুক্ষ্ম সকল নাদের নিত্য নাদময়ী, তথা শৃঙ্গার, করুণ, বীর, শান্ত ইত্যাদি নবরসাত্মক বাক্যের ছন্দে ও অলঙ্কারে পরম রসময়ী – কাব্য-কলনাদিনি, তাই এই রসতমা সরস্বতী-নদীতমা। নদী কেবল জলের আধার নয়, শব্দের/নাদেরও উৎস। নদ শব্দটি নাদের দ্যোতক, নাদের থেকেই এসেছে। বাগদেবী মা সরস্বতী নাদময়ী। ইনিই ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিনী, নিত্য সঙ্গীতময়ী; ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ রূপে ইনি সঙ্গীত। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সরস্বতী নামে এক পবিত্রতোয়া নদী প্রবাহিতা। এক সময় এই সরস্বতী নদী তাঁর দুই তীরে শস্যাদি উৎপাদনের দ্বারা আর্য্য সন্তানদের জননীর মত স্নেহে পালন করে ছিলেন। এঁরই উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে, ব্রহ্মাবর্ত ভূমিতে অগণিত আর্য্যকন্ঠে উচ্চারিত হোত সামগান। শিষ্যগণ পরিবৃত আচার্য্য কন্ঠে নিরন্তর বেদানুশীলন, জ্বলতো হোমশিখা, উঠত প্রণবধ্বনি। সরস্বতী বিধৌত এই পূণ্য ভূমিতেই আর্য্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার উৎপত্তিও ক্রমবিকাশ। এখানেই প্রথম মানুষ পেয়েছিল মূক-কন্ঠে প্রণব সঙ্গীত। বাগ্‌দেবীরূপী সরস্বতীই বৈদিক মন্ত্র ও বৈদিক স্তুতির মূলীভূত কারণ। তাঁর সাহচর্য্য ছাড়া কোনও যজ্ঞই সম্পন্ন হয় না। সরস্বতী নদীর কূলে নিত্য যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোত। সেই হিসাবে নদী মাতৃকা, মা সরস্বতী, যাগযজ্ঞেরও অধিষ্ঠাত্রীদেবী। দেবী সরস্বতীর জ্যোতির্বিভূতি এবং নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতার সমন্বয়ে তিনি হন শ্বেতবর্ণা-তাঁর বসন, ভূষণ ও বাহনেও লেগে যায় ঐ রঙ। তিনি হন সর্ব্বশুক্লা। দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসনা এবং হংসবাহিনী। এই দুটিই নদী সরস্বতীর দান। নদী সরস্বতীর দুই কূল আলোকিত করে ফুটে থাকতো রাশি রাশি শ্বেতপদ্ম এবং বিহাররত থাকতো অসংখ্য শ্বেতহংস। প্রথমটি দেবীর আসন ও দ্বিতীয়টি দেবীর বাহন।

সরস্বতীর বাহন হাঁস কেন?

মা সরস্বতী জ্ঞানদেবী। হাঁসের জৈব গঠন ও জৈব প্রকৃতির সঙ্গে, জ্ঞানসাধনার রীতি-প্রকৃতির সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট। হাঁসের জল ও দুধের জ্ঞান/বিবেক আছে। জলের মধ্যে দুধ ঢেলে দিলে হাঁস জল থেকে কেবল মাত্র সেই দুধটুকু তুলে নিয়ে পান করতে সক্ষম। একই সঙ্গে আছে হাঁসের দ্রুত ও নিশ্চল গতি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমান ভাবে বিচরণে সমর্থ। হাঁসের পাখনা ও পালক গুলো এমন ভাবে গঠিত যে সারা দিন জলে থাকলেও, তার গায়ে একফোটা জল লাগে না। যেমন সিদ্ধ সাধকেরা সংসারে থেকেও সংসারে জড়িত নয়, কর্ম করেও অকর্ত্তা, দেহে থেকেও দেহবোধ বিরহিত। হাঁসের এই সকল বৈশিষ্ট্য থেকে জ্ঞানময় প্রকৃষ্ট মার্গের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের সাধনা এবং জ্ঞানীর আচরণ-এই তিনটি গুণই হাঁসের মধ্যে পাওয়া যায়। এই কারণেই, এই তিনটি গুণ যেই সাধকের মধ্যে পাওয়া যায় তাঁকেই পরমহংস বলা হয়। সুতরাং জ্ঞানময়ী দেবী সরস্বতীর বাহনরূপে হাঁসের যোগ্যতা সব দিক থেকেই সমীচীন হয়েছে।

কার্ত্তিক

দেব সেনাপতি, কার্ত্তিক গণেশের ছোটভাই (যদিও অনেকের মতে তিনি গণেশের বড় ভাই)। প্রবল পরাক্রমী দুর্ধর্ষ অসুর, তারকাসুরকে বধের উদ্দেশ্যেই দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম।

শিব ছাড়া শক্তি নয়, শক্তি ছাড়া শিব নয়। এক সময় শিব-পার্ব্বতী আনন্দে বিহার করছিলেন। সেই সময় শিবের তেজঃ স্খলিত হয় ধরিত্রীর বুকে। ভয়ঙ্কর সেই তেজঃ। ধৈর্য্যশীলা হয়েও পার্ব্বতী সেই তেজঃ ধারণ করতে পারেন নি। তা তিনি নিক্ষেপ করেন জলন্ত অগ্নিতে। অতঃপর অগ্নিদেব সেই তেজঃ নিক্ষেপ করেন পবিত্র গঙ্গাগর্ভে। হরপার্ব্বতীর তপস্যা, পৃথিবীর সহিষ্ণুতা, অগ্নির বীর্য্য, গঙ্গার পবিত্রতা - এতগুলো শক্তির সমন্বয়ে আবির্ভুত হন এক দিব্যকান্তি ষড়ানন (ছয় মুখযুক্ত) মহাবীর দেবকুমার। পবিত্র গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে উপস্থিত হন এক শরবনে। দৈবক্রমে সেই পথ দিয়ে ছয়জন কৃত্তিকা যাচ্ছিলেন। দেখলেন অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় সদ্যজাত এক কুমার শরবনে ভাসছেন। মাতৃসুলভ স্নেহবাৎসল্যে উদ্দেলিত হয়ে এই ছয়জন কৃত্তিকা এই কুমারকে স্তন্যপান করালেন। ছয় মুখে ছয়জন ধাত্রীর স্তন্য পান করেছিলেন বলে তাঁর নাম ষড়ানন। কৃত্তিকাদের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম কার্ত্তিক।

যৌবশক্তির প্রতিমূর্ত্তি কার্ত্তিক। নেতৃত্ব প্রতিভা ও বিক্রমে তিনি তারকাসুরকে বধ করে, ফিরিয়ে এনেছিলেন হৃতা রাজলক্ষীকে, রক্ষা করেছিলেন দৈবী সংস্কৃতি ও দৈবী সাধনাকে। অনেকের ধারণা কার্ত্তিক ছিলেন চিরকুমার। অবিবাহিত, অকৃতদার। তারকাসুর বধের আগে তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু দেবীপুরাণের মতে, পরে তিনি বিবাহিত হন দেবসেনার সঙ্গে। দেবসেনা প্রকৃতির অংশস্বরূপা মাতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা মা ষষ্ঠী দেবী। যাঁর বিষয়ে এই লেখায় প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

ময়ুর কেন কার্ত্তিকের বাহন?

ভাবলে খুব অবাক লাগে, দেবসেনাপতি, বীর্য্য, পৌরুষ ও যৌবশক্তির প্রতিমূর্ত্তি, কার্ত্তিকের বাহন ময়ুর। এই সুন্দরতমঃ (পাখি) বাহন বিলাসীর পক্ষেই শোভনীয়, কিন্তু যৌবশক্তির প্রতিমূর্ত্তি, দেবসেনাপতির উপযুক্ত নয়। তার চেয়ে হাতি, সিংহ, বাঘ কিম্বা ঘোড়াকে বাহন হিসাবে গ্রহণ করলে যথাযথ হোত। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে, ময়ুর বাহনই কার্ত্তিকের যথার্থ হয়েছে। সৌন্দর্য্য ও বীর্য্য, এই দুটো গুণ কার্ত্তিকের চরিত্রে বিদ্যমান। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ সুন্দরতম দেবতা এবং শত্রুহন্তা। সুতরাং তাঁর বাহনটিও এমন হওয়া চাই যাতে এই দুইটি ভাবই রক্ষিত হয়। ময়ুরের সৌন্দর্য্য ও বীর্য্য দুইই রয়েছে। তাই ময়ূর হয়েছে কার্ত্তিকের বাহন। সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে ময়ুর যে সুন্দরতমঃ, এ কথা মানতে আশা করি কারোরই আপত্তি থাকবে না। আর ময়ুরের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা? ময়ুর, বড় বড় বিষধর সাপ গুলোকে সুকৌশলে অনায়াসে মেরে ফেলে অপূর্ব্ব যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ময়ূর দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং তার নিজের সমাজকে, বিশেষত ময়ূরীকে রক্ষার জন্যে (যেমন কার্ত্তিক হৃতা রাজলক্ষীর রক্ষার্থে তারকাসুর কে বধ করেছিলেন) সাধ্যাতীত বিক্রম প্রকাশ করে শত্রু দমন করতে সক্ষম। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি, শত্রুজয় ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। সাপের সঙ্গে ময়ূরের যুদ্ধকৌশল দেখার মত। নখ ও ঠোঁটই তার অস্ত্র আর তার পাখনাই তার ঢাল। পাখনা দিয়ে ঢালের মত শত্রুর আঘাত প্রতিহত করে এবং নখ আর ঠোঁট দিয়ে শত্রুকে আঘাত করে। ময়ুর সুর্য্য ওঠার আগেই উঠে যায়। ময়ূরের অনলসতা, অতন্দ্রতা, সতর্কতা ইত্যদি গুণ তৎপরতার পরিচায়ক। যে ক্ষত্রিয় শত্রুজিগীষু তাকেও হোতে হয়, অনলস, অতন্দ্র, সতর্ক ও তৎপর। এই কারনে ক্ষত্রিয়গুণ সম্পন্নগুনের অধিকারী ময়ূরই পেয়েছে কার্ত্তিকের বাহনত্বের অধিকার।

নবগ্রহ (গ্রহদেবতা) ও তাঁদের বাহন

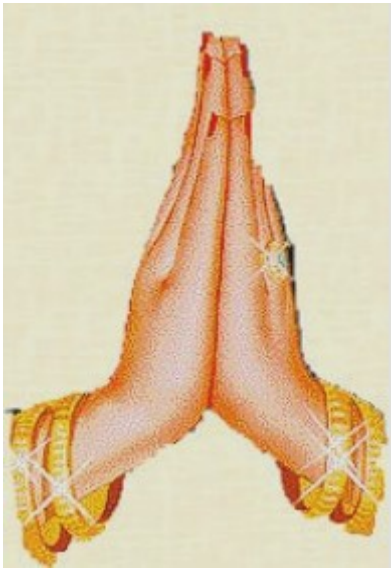

Castles and Kilts

by Rijuta Chakraborty

The Cliffs of Moher in County Clare, Ireland, stretch approximately 14 kilometres from the north to the south of the Irish west coast. It towers 214 metres high at its greatest point, with an almost perpendicular drop into the looming Atlantic ocean below. It's alarmingly threatening to look at. It's a geological narrative of its country. It's beautiful in a way that seems unearthly. And it's a sight that I have wanted to see , a place that I have wanted to experience for the last seven years.

I travelled 18,000 kilometres this June, to live the dream I've been dreaming for the last 7 years. I'll be honest in admitting that my fascination with Ireland and Scotland started with the influence of cinema and the role these countries had in setting a location within a fantasy world. The rugged mountains, the rolling hills and don't even start with me on castles! And with that in mind, after 3 years of studying architecture in university, I think it's safe to assume where the solidarity for my passion in British cultural and architectural history has come from. Being terrified of plane journeys, and the fact that I had never actually travelled alone *anywhere*, were not so much an issue compared to the thought that if I didn't seize this chance then my dream would only ever remain just that; a dream.

So I did my research, went to a travel agent and got a full time job. I planned my trip to spend 13 days in Ireland and Northern Ireland, and 15 days in Scotland, taking guided tours through each of the countries. In another 7 months, thanks to my very understanding and, well, there's really no other word for it but 'cool' parents, I was packed and waiting in line at Auckland International Airport with my best mate, Aliyah, who had agreed to join me for the first ten days of my tour. After 26 hours and (literally) the longest flight in the world later, we landed in Dublin.

Let me tell you something about expectations that first week. They were blown out of the water. Dublin was a city alive with music, food, people, and of course Guinness! There wasn't a street in Dublin where we didn't spot at least two neighbouring pubs on. The pub culture was welcoming, not just for avid drinkers, but rather as a meeting place and a common destination for almost all those that were living or travelling there. The Irish country side was even more breathtaking. In Inis Mor, we booked a private horse cart to tour the small island off the west coast of Ireland. As the sun beat down on our backs, we climbed the prehistoric hill fort Dun Aengus that overlooks a hundred metre high cliff. We travelled through Ireland with a bus load of different, but the

same people, accompanied by a very authentic Irish tour guide who was always more than willing to pull out his guitar and serenade us with songs. When we finally reached the Cliffs of Moher on the last day of the tour, the weather was bleak, clouds brewing with dread and yet the cliffs held their own majestic presence and I experienced a moment of true content. In Belfast, Northern Ireland, I learnt a more sobering lesson as the grim reality of the country's riots were enlightened upon us. At the peace walls which separate the Protestant and Catholic regions of Northern Ireland, artists and locals had taken to graffiti the twenty-five feet high, police patrolled, brick barriers and ironically create an international wall of art that was only to be adorned in messages of compassion, peace and love written by travellers from all over the globe. And yet, through all this wonder, when I stayed with a Bengali family for my last night in Dublin, I was thrilled at the prospect of eating daal and aloo posto again for lunch instead of a steak baguette. Because let's be honest, *nothing* still quite lives up to the joy of posto on a Sunday afternoon…

For as long as I can remember, I have been terrified of heights. My knees literally shake, eyes blur with tears and the anxiety of unlikely outcomes (that mostly result my death) take over my brain. Yet, in the Scottish Highlands I scaled mountains just to see the ruins of a castle, and trekked in the cold rain and wind (as expected in a traditional Scottish summer) on narrow hiking trails through Glencoe because I didn't care about the fall down anymore, but rather what waited for me at the top. I learnt more about my limits, my abilities and myself in these 28 days than I have in the last 22 cumulative years.

I made good friends with budding travellers like me that were from all over the world, whether it be Mexico or Switzerland. We didn't know each other very well, but in a way, we were all the same as we had made decisions that had led us to the same destination. In all this however, I never came across a fellow Indian traveller of my age. Whether it be the booked tours or even the parts of my trip where I wandered through the streets of

Dangling my feet over the edge of Dun Aengus!

the Shamrocker tour group

Landing in Edinburgh 13 days later, as I made my way to the hostel from the airport, I had trouble keeping my mouth closed. I was in complete awe. To explain, the entire of Edinburgh city centre was a World Heritage Site, where 'New Town' was 200 years old and 'Old Town' was, in fact, *1200 years old.* In every direction that I looked, I was met with the proof and progress of our civilisation cemented into the surrounding architecture. It was as if something had suddenly abducted me from within my own mind and shown me a different world and all the possibilities of the coming adventure.

Dublin and Edinburgh alone. It was sad, and a little shocking to find that people of my ethnicity, of my age, rarely delve into such activities and venture out of their own worlds. In fact, in Loch Ness (while on a hunt to find 'Nessie') I bumped into two Bengali families that were also touring through Scotland. After a friendly introduction, they were stunned when I told them that I was travelling alone with a bus full of people that I had only just met days ago. I might not have noticed their disbelief if it weren't for the fact that they kept coming back to this point despite my attempts to steer the conversation in another direction. After this encounter, it really made me wonder why we didn't encourage our children to explore the world and learn things in more unconventional ways.

Kilchurn Castle, established c. 15th century

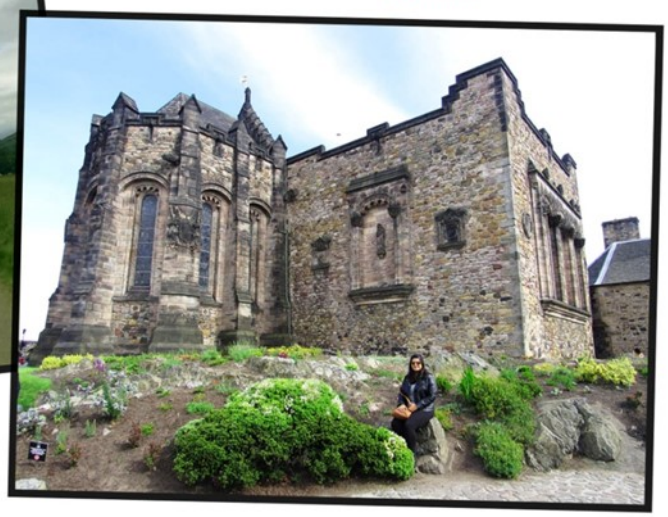

Edinburgh Castle. Probably my favourite thing about Scotland!

This trip to the other side of the world was an eye opener in countless ways. What started out as a childhood fantasy turned out to be a character building, educational, confrontational and thrilling adventure of a lifetime. It taught me to be brave and unwavering in the face of others' and my own anxieties. It opened up a whole new platform as to how I can learn about and actually experience architecture in a way that doesn't involve a lecture theatre. Coming back, I feel as if I have a lot more faith and certainty in myself than I ever did before. It's something that I hope all my friends and family get to experience in their life. And despite all the stigma that surround girls travelling on their own, I can fortunately say that not only were the people I met astonishingly kind and accommodating, but they were much more like me than I could have ever imagined. So maybe it's time to redefine the way we learn about things and grow as we come of age, or perhaps *continue* to grow and actually *discover* this home that we call Earth. Instead of just reading and discussing the things we want to do, let's find the courage to go out and actually do them. If I've learnt anything from this experience, it's that the world is more wonderful than I could have ever imagined. It would be truly a shame to miss out.

Urquhart Castle, Lochness

Neolithic Standing Stones of Stenness at Orkney

Climbing Arthur's Seat in Edinburgh

বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গনগনি

–সৌম্য গাঙ্গুলী

কবি লিখেছিলেন, 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;- তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,'। শতবর্ষ পার হয়ে যাওয়ার পরেও এই কবিতাটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ভ্রমণপিপাসু বাঙালি, বিশ্বের সর্বত্র বেড়াতে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দক্ষিণবঙ্গ (দিঘা বাদে) এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় বাঙালিদের মধ্যে। অথচ দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদও কোনও অংশে কম নয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা রেলস্টেশনের কাছেই গনগনি নামক যে আশ্চর্য জায়গাটি রয়েছে, সেটিকে অনায়াসেই বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলা যায়। শীলাবতী নদীর ধারে প্রাকৃতিক কারণে ভূমিক্ষয়ের ফলে বেশ কিছুটা অঞ্চল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত। ট্রেনে, বাসে বা গাড়িতে অনায়াসেই যাওয়া যায়। অথচ শুধু প্রচারের অভাবে এরকম একটি সুন্দর জায়গা এখনও পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারেনি। সেই কারণেই ওই অঞ্চলের বিশেষ উন্নতি হয়নি।

শীলাবতী নদী অত্যন্ত সুন্দর। ভূমিক্ষয়ের আশ্চর্য রূপ দেখে যে কেউ মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আশেপাশে বাড়িঘর নেই। যাঁরা নির্জনতা উপভোগ করতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা। সারাদিন কাটানো যায় গনগনিতে। চাইলেই যাওয়া যায়। বন দফতরের বাংলোও আছে কাছেই। বুক করতে হয় মেদিনীপুরের বন দফতর থেকে। একদিনের জন্য ঘুরে আসতে পারেন। বিশেষ করে শীতকালে গেলে ভাল লাগবেই, নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ফিরে দেখা

- প্রভা ঘোষ

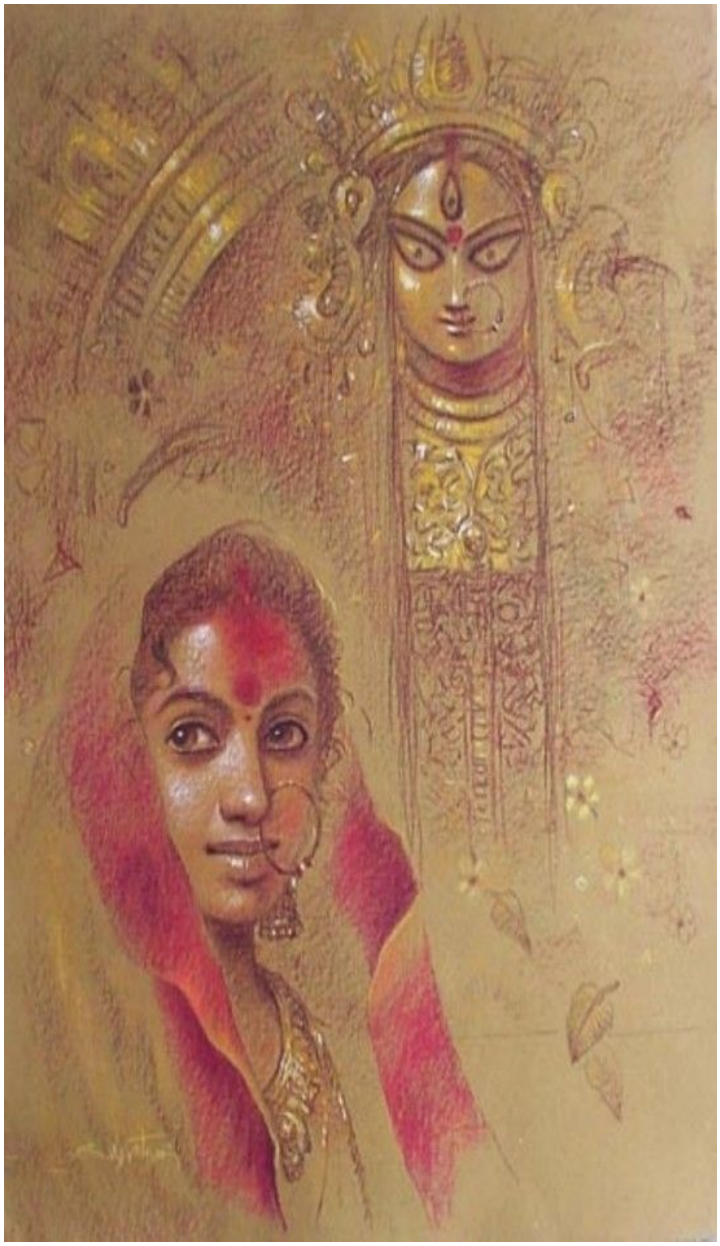

এবারের পুজোটা মিতা মায়ের সাথে কাটাবে ঠিক করেছে তাই বাপের বাড়ী এসেছে। পুজো প্যান্ডেলের মা , সে তো সকলের মা, কিন্তু বাড়ীতে যেই মা আছেন সে তো একেবারে মিতার একার মা। বাড়ীতে ঢোকার আগে মিতা ভাবল প্যান্ডেল টা একবার ঘুরে যাবে, যেমন ভাবা তেমন কাজ । পুজো প্যান্ডেলে তখন পাড়ার ছেলেরা মায়ের প্রতিমা সাজাচ্ছে । কারো হাতে ত্রিশূল, কারো হাতে খাঁড়া। মিতা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে প্রনাম করতেই একজন ছেলে বলে উঠল- "দ্যাখ দ্যাখ, মেয়েটা আমাদের ঠাকুর ভেবে প্রনাম করছে", মিতা কনো রকম অভিব্যাক্তি প্রকাশ না করেই ওখান থেকে বেরিয়ে পরে, ঠোটের কোনে মুচকি হাসি খেলে যায় মিতার এটা ভেবে যে, ওর সিঁথির এক চিলতে সিঁদুরের রেখাটা ওদের চোখে পরেনি । মিতা আর দাঁড়ায় না কোথাও সোজা বাড়ীর দিকে হেটে যায়।

দরজা খুলেই মা উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না, "কি রে, এত দেরী করলি কেন,?" মিতা মায়ের সাথে দু চারটে কথা বলেই বেড়িয়ে পরে বাড়ী থেকে , সোজা চলে যায় সেই বড় মাঠ টায় ... এই মাঠেই ওরা চার বন্ধু ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিত গল্প করে । সেই মাঠ টা আজো একি রকম আছে, কিন্তু বদলে গেছে মাঠের চারপাশ , ছোট ছোট বাড়ী গুলো ভেঙ্গে সব বড় বড় বাড়ী হচ্ছে । মাঠের এক পাশে মিতার দিদিমার বাড়ী। বাগান ঘেরা ছোট্ট চালা ঘরের বাড়ী ছিল দিদিমার , সেটাও ভেঙ্গে এখন দোতলা বাড়ী হচ্ছে। মিতার পাটা অজান্তেই দিদিমার বাড়ীর দিকে এক পা এগিয়ে গেলো কিন্তু সাথে সাথে মনে পরল শিতল দার কথা, থেমে গেল মিতা। দিদিমা তো বাড়ীতে নেই কিন্তু দিদিমা র নাতি শিতল দা এখন নিশ্চয়ই আছে বাড়ীতে । সেই ছোট বেলা মায়ের সাথে একবার অনেক ভোরে দিদিমার বাড়ী এসেছিল মিতা... বাগানে জামরুল গাছ টার দিকে অনেক্ষন তাকিয়ে একটা কচি সবুজ জাম্‌রুলের দিকে যেই হাত বাড়িয়েছে ওমনি পেছন থেকে বাজখাই গলায় "কে রে?" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল শিতল দা। ভয়ে একছুটে সোজা বাড়ী পালিয়েছিল সেদিন মিতা। বাব্বা! সেই গলা আজও মনে পরলে ভয়ে বুক কাপে মিতার। এই সব চিন্তার মধ্যে মধুমিতা যখন ওর ছেলে বেলায় হারিয়ে গেছে ঠিক তখনি "কি রে চিনতে পারছিস?" বলে ডেকে ওঠে কেউ , ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখে ধপধপে সাদা শাড়ী বড় গোল টিপ আর ঝলমলে হাসি নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাগর, সাগরিকা । মিতা কিছু বলার আগেই সাগর অভিমানের সুরে বলে বলে চলে – " কিরে একদম ভুলে গেছিস তাই তো? আর মনে রাখবি কেন বল? সেই ছোটবেলার ...। ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মিতা বলে –"সেই ছোট বেলার সাগর এখন অনেক বড় লোকের বউ, তাই তো" সাগরের হাসি আরো চওড়া হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পরে আর মিতার হাত ট জড়িয়ে বলে " ভুলিস নি তাহলে বল, কত্ত দিন পর দেখা বল, কেমন আছিস তুই? কবে এলি? এখন থাকবি তো? আর " মিতা ওর উত্তেজনা সামাল দিতে বলে "দাড়া,দাড়া, এক এক করে সব বল্ আগেই তুই বলত তুই কেমন আছিস? তুই কি ভেবেছিস আমি কনো খবর রাখিনা, আমি সব জানি তুই এখন মস্ত বড়লোক এই পেল্লাই বাড়ী গাড়ী ... "। সাগর মুখ ভার করে বলে "আগের ওই মাঠের আড্ডা দেওয়ার দিন গুলোই ভালো ছিল রে" মিতা অবাক হয়ে জানতে চায় "বেশ তো আছিস রে তাও তোর এইসব মনে হচ্ছে কেন?"

সাগর বলে" ধুর, কিসের বেশ, সেইসব দিন গুলো ভাব, সব কাজ সেরে এক ছুট্টে এই মাঠে চলে আসতাম তারপর চারজন মিলে আলু চচ্চরি আর মুরি খেতে খেতে আড্ডা , সময় এর কনো হুঁশই থাকত না, কখন সময় কেটে যেত, তারপর যে যার বাড়িতে গিয়ে খেতাম পিটুনী... উফফফ ! কি মজার দিন ছিল " ... মিতা –" হ্যা তা ছিল , তবে এখনই বা খারাপ কি " সাগর বেশ গাল ফুলিয়ে বলে -

" খারাপ নয়, তবে শোন, বিয়ের পর প্রথম দিন, নতুন বউ আমি , বাসি জামাকাপর ছেরে পরিষ্কার শাড়ী পরে সকালে গেলাম রান্না ঘরে , ওমা! গিয়ে দেখি ওখানে দুটো হাওদা উনুন আগে থেকেই জ্বলছে,। ভালো কথা , আমি কি রান্না হবে দেখবার জন্য সব্জির ঝুরিতে হাত দিতে যাব ঠিক তখনি কমলার মা এসে হাজির 'বৌমনি আজ রান্নার কি কোটা বাটা হবে বলো ,' বলে বটি সব্জির ঝুরি নিয়ে বসে পরল , উল্টো দিকে ততক্ষনে ঠাকুর এসে হাজির , কাধের গামছা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল কোন ডাল চাপাবে , হাজার একটা ডালের ফদ্দ শুনিয়ে গেলো, আমি তো বাপু অদ্দেক ডালের নামই শুনি নি , আমি কি করব আর কি করব না ভাবতে ভাবতেই রবি দা এসে হাজির , 'বৌমা বাজার থেকে কি আনব বলো? কোন মাছ আসবে আজকে? , এইবার তুই বল , এখানে আমার কাজ টা কি? আমি কি করছি সকাল থেকে? মিতা – "ভালোই তো আছস, " সাগর ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে "আমার কথা ছার, তুই এইবার বলতো মিতা , তোর তো নাকি রেলের অফিসারের সাথে বিয়ে হয়েছে, তুই নাকি প্রতি বছর বেড়াতে যাস, তার জন্য নাকি টিকিট ও কাটতে হয় না রেলের , ভালই তো আছিস," ...

মিতা হেসে বলে "হ্যা, তা আছি, বেড়াতে কার না ভালো লাগে বল, তবে ঐ যদি মনের মত সঙ্গী সাথে থাকে , এই সেবারের কথা ,এখনো ছবির মত দেখতে পাই, সকাল বেলা ফাকা রাস্তা, অমর কন্টক থেকে হেটে নর্মদা র উৎস দেখতে গেলাম, " সাগর অবাক হয়ে বলল ''নদীর উৎস মানে তো সেই অনেক জল' মিতা বলল- "না রে আমিও তাই ভাবতাম কিন্তু একদম গিয়ে একদম বোকা হয়ে গেছি , ওখানে পৌছে দেখি মাটির তলা থেকে ওল্প ওল্প জল বেড়িয়ে আসছে সেটাই নাকি নদীর উৎস মুখ । সেখান থেকে তির তির করে যেই জলের ধারা বেড়িয়ে আসছে সেই ধারাই নাকি শেষে গিয়ে নর্মদা জলপ্রপাত হয়েছে, ভাব কি অবাক কাণ্ড।" সাগর চোখ বড় বড় করে বলে "নিজের চোখে দেখলি বলে এত কিছু জানতে পারলি ।" মিতা উৎসাহ পেয়ে বলে চলে "শুধু কি এই রে, নদী গুলো নিয়ে কত রকম গল্প বানায় স্থানীয় লোক জন, নর্মদা নদীতে তপ্তী নদী এসে মিশেছে, ওরা নাকি স্বামী স্ত্রী" এই কথায় দুজনেই উচ্ছবল নদীর মত হেসে ওঠে ।

হাসির দমক সামলে সাগর বলে " এই শোন শুধু দেশ কি তুই তো নাকি বিদেশ ও ঘুরেছিস"। মিতা –" হ্যা , গিয়েছি নিউজিল্যান্ড " সাগরের চোখ কপালে উঠে যায় । "বলিস কি রে, সেই যে ফার্ন পাতা আঁকা পতাকায় , কালো জার্সি,ক্রিকেট খেলে ওরা, ওদের দেশে তুই ঘুরে নিজে গিয়ে ঘুরে এসেছিস , " মিতা- "হ্যা একদম ঠিক বলেছিস, সিল্ভার ফার্ন এর দেশ, জানিস সাগর, ওদের দেশে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে, তবে বেশীর ভাগই সুপ্ত , সেই সব আগ্নেয়গিরি ঘুরে দেখা যায়, গিয়ে দেখি কিছু কিছু জায়গার মাটি টগবগ করে ফুটছে, ওগুলোকে ওরা boiling mud pool বলে, আবার কোথাও গরম জলের ফোয়ার তীর বেগে মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে " সাগর অবাক হয়ে বসে পরে পাশেই এক বাড়ীর রোয়াকে "ওমা তাহলে তুই আগ্নেয়গিরির মধ্যে হেটে ঘুরে বেড়িয়েছিস?" মিতা হাসে ওর পাশে বসে বলে " ওত অবাক হোস না, অবাক হওয়ার মত উপাদান আমাদের নিজেদের দেশেই কম আছে নাকি? জানিস ওই আগ্নেয়গিরি গুলোর মাটি খুঁড়লে এক রকম হলুদ রঙ্গের মাটি বেরোয়, সেই মাটির রঙ দিয়েই আমাদের দেশের অজন্তা ইলোরার গুহা চিত্র আঁকা হয়েছে, শুধু মাটি বললে ভুল হবে, গাছ পাতা ফুলের রশ মিলিয়ে মিলিয়ে তৈরী হয়েছে প্রাকৃতিক রঙ সেই রঙ দিয়েই আঁকা হয়েছে ঐ গুহা গুলোর সেই বিশাল বিশাল ছবি।

তবে কি জানিস তো গুহার মধ্যে বছরের পর বছর আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য সেই সব রঙ এখন অনেক ফেড হয়ে গেছে , তবে এখন অবশ্য আলো জ্বালানো বন্ধ হয়ে গেছে , সুর্যের আলোয় দেখতে হয় ওই সব ছবি" বেড়ানোর গল্প বলতে বলতে মিতার নেশা লেগে যায় যেন, বলার আনন্দেই বলে চলে মিতা, খেয়ালই থাকে না পাশে বসে থাকা সাগর সেই সব শুনছেও কিনা, মিতা না থেমেই বলে চলে -

" জানিস দার্জিলিং এ আমরা পাহারের গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলা অবাক হয়ে দেখলাম আমরা উপরে আর নীচে মেঘ, টাইগার হিলের সান রাইস, বাতাসিয়ালুপ থেকে দেখা কাঞ্চঞ্জঙ্ঘার চূড়া, অপুর্ব।। জানিস আমরা চেরাপুঞ্জিতেও ছিলাম বেশ কিছু দিন পৃথিবীর মধ্যে অর্ধেক বৃষ্ট ওখানেই হয়, সারাক্ষন ঝিমঝিম করে পরে চলেছে মিষ্টি বৃষ্টি । মুসৌরি তে গায়ের উপর দিয়ে মেঘের উড়ে যাওয়া দেখে চমকে গিয়েছিলাম আর তাজমহল, তাজমহলের কথা না বললে তো বলাই হল না কিছু "। সাগর অনেক্ষন চুপ থাকার পর বলে উঠল " শাহাজাহান আর মুমতাজ এর তাজমহল"।

মিতা যেন চোখের সামনে সবটা দেখতে পাচ্ছে সেই ভাবেই ঘোর লাগা চোখে বলে চলে , "হ্যা একদম তাই, এখনো তাজমহলে গেলে মনে হয় শাহাজাহান মুমতাজের স্মৃতি আগলে বসে আছে।

জানিস আমি একটা উচু জায়গায় বসে আঁকার ও চেষ্টা করেছিলাম , কিন্তু ওই সিকিউরিটির বকা খেয়ে মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে গেলো, জানিস কত সুক্ষ সুক্ষ ফুল পাতার নক্সা আকা সারা তাজমহলের গায়ে, আগে নাকি আসল মনি মুক্ত লাগানো থাকত সেই নক্সায়, এখন সব চুরী হয়ে গেছে।" সাগর অবাক হয়ে যায় "বলিস কি রে, বউ কে এত ভালোবাসত শাহাজাহান? ??" মিতা বলে, " এই শুনেই অবাক হচ্ছিস, তুই জানিস যারা নাকি তাজমহল বানিয়েছিল সেই সব লোকের আঙ্গুল কাটা গিয়েছিল শুধু এই ভয়ে যেন তাজমহল একটাই থাকে এই গোটা পৃথিবীতে, আর কেউ কনোদিন যেন আর এই নিখুঁত ভাস্কর্য আরেকটা স্থাপন না করতে পারে, এই কঠীন বাস্তব শোনার পর আমার তাজমহল দেখে সব ভালোলাগা উবে গিয়েছিল"।

সাগর অবাক হয়ে বলে "ঈশসসস! এত সুন্দর একটা শিল্পের আড়ালে এত নিষ্ঠুর সত্যি লুকিয়ে আছ?! " মিতা এক গাল হেসে বলে "থাক এইসব , তার থেকে বরং তোকে কাশ্মিরের গল্প বলি, এক্ষুনি মন ভালো হয়ে যাবে, জানিস পাহাড়ি রাস্তার দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পর পর আপেল গাছ আর গাছ ভর্তি লাল লাল আপেল ঝুলছে, আর সেই আপেলে একটা কামড় দিলেই রস কুনুই পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। আর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে রঙ বেরঙ্গের ফুলের বাহার , দেখলে মনে হয় ওরা সুর্য থেকে গোলাপী রঙ চুরী করে টুক টুকে লাল ডুবন্ত সুর্য কে বলছে –'আমি তোমায় ভালোবাসি, আবার কাল এসো'।" সাগরের চোখ যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো কাশ্মীরের সুর্যাস্ত আর গাছে ঝুলতে থাকা গোলাপী আপেল গুলোকে, মিতা সাগরের উদাস চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল ওর মনের ভাব তাই আরো সুন্দর করে ওর সামনে তুলে ধরেত থাকল টুকরো টুকরো কাশ্মীর

" পাহাড় ঘেরা ডাল লেকের স্থির নীল জলে ছোট্ট ছোট্ট হাউসবোট ভেসে থাকে, তার মধ্যে একটা তেই আমরা ছিলাম , শিকারায় বসে নীল জল আর পাহাড় দেখতে দেখতে মনটা হারিয়ে যায় ঠিক তখনি একটা মিষ্টি সুরেলা বাচ্চা কন্ঠ স্বর তোকে ফিরিয়ে আনবে বাস্তবে আর সামনে চোখ তুলে তাকিয়ে আরো বেশী অবাক হয়ে যাবি, ফুলের মত ফুটফুটে টুকটুকে ফর্সা একটি বাচ্চা মেয়ে এক গোছা বাহারী ফুল রেখে চলে গেল শিকারায়।

সাগর – "তুই এত সুন্দর করে বলছিস যেন চোখের সামনে আমি মেটির হাসি মুখ দেখতে পেলাম ফুলের গন্ধ নাকে ভেসে এলো , ডাল লেক খুব সুন্দর , তাই নারে? "

মিতা হেসে বলে " খুব সুন্দর, কিন্তু ওই সুন্দর নীল জলের নীচে কত বিষাক্ত গাছ আছে জানিস, যার জন্য ডাল লেকের জলে কেউ নামে না, সব সুন্দরের পেছনেই খুব ভয়ের কিছু লুকিয়ে থাকে"

সাগর- বলিস কি রে ? সে সব থাক তুই বরং আমায় কাশ্মীরের গল্প বল, আচ্ছা তুই কাশ্মীরী শাল কিনেছিস?"

মিতা- "শুধু কিনিনি , কি করে শাল তৈরি হয় নিজের চোখে দেখেছি, কাশ্মীরে শঙ্করাচার্যের মন্দির আছে , সেখানে মহিলারা বসে শালে রঙ্গীন সুতোর নক্সা করে, আমি অনেক্ষন বসে ওদের হাতের সুক্ষ কাজ দেখেছি , জানিস আমরা কাফকা ফরেস্ট ও গিয়েছি সেখানে নাকি তখন বাঘ ছাড়া হয়েছিল, আমরা বাঘ দেখিনি , হরিণ দেখেছিলাম , অপূর্ব সেই দৃশ্য , ওরা দল বেঁধে রাস্তা পার হচ্ছিল "সাগর উঠে দাঁড়ায় "তোর কথায় কথায় আমারো অনেক জায়গা ঘোরা হয়ে গেলো রে মিতা, এইবার যাই মায়ের শরীর টা ভালো নেই "

মিতা "আমাকেও যেতে হবে রে, তোকে বললাম ,তাই আরো একবার আমারো আবার ফীরে দেখা হয়ে গেলো সব জায়গা , ভালো থাকিস সাগর। চলি "

মিতা হাসি মুখে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় ।

গিড্ডে সাহেব – দ্য সেলসম্যান

দিলীপ কুমার দাস
(ওয়েলিংটন)

জানুয়ারী মাসের এক রবিবারের দুপুর গড়িয়ে বিকেল। দক্ষিণ গোলার্ধে এখন গ্রীষ্মকাল। এইসময় নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়াটা বেশ মনোরম – অনেকটা বাংলার ফাল্গুন মাসের আবহাওয়ার মত। বড়দিন-নববর্ষের ছুটি শেষ হয়ে জীবনযাত্রা আবার গতানুগতিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছি। আমাদের পাড়াটা পাহাড়ের উপর। পাড়ার একপাশে ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে অনেক নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। ঐরকম কিছু বাড়ীর সামনে 'এই বাড়ী বিক্রয় হইবেক্' নোটিশ লাগানো আছে।

দেখি সেইরকম একটা বাড়ীর সামনে অমিতাভ বচ্চনের মত লম্বা এক সাহেব স্যুট-বুট পরে তার রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর নিশান উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম সাহেব বাড়ী বিক্রির দালাল। সম্ভাব্য খদ্দের পাকড়াও করে বাড়ী দেখানোর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছে। কাছাকাছি আসতে সাহেব হাসি হাসি মুখ করে আমাকে বলল, 'গিড্ডে' (G Day - Good Day-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। আমিও দাঁড়িয়ে গিয়ে হেসে বললাম 'গিড্ডে'। সাহেব নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ী কিনবে?' আমি সামনের বাড়ীটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বাড়ী?' সাহেব বলল, 'এটা আছে, আর এটা ছাড়াও আরো কয়েকটা আছে আমার হাতে।' আমি বললাম, 'সাহেব, এই বাড়ীটা আমি অল্প কিছুদিন আগে তৈরী হতে দেখলাম। বাড়ীটা তো বেশ বড়। সুতরাং এর দামও বেশ ভালোই হবে। I don't have a deep pocket to buy it। (অর্থাৎ আমার ট্যাঁকে এটা কেনার মত অত ডলার নেই)।' সাহেব বলল, 'ডলারের জন্য ভেবো না। ব্যাঙ্কের কাছে বাড়ীটা বন্ধক রেখে ডলার ধার পাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। এদেশে লোকে এভাবেই বাড়ী কেনে।' আমি বললাম, 'তা তো দেবে। কিন্তু তারপর সারাজীবন ধরেই তো সুদ সমেত ধারের কিস্তি শোধ করে যেতে হবে। তাছাড়া আমার তো থাকার জন্য একটা বাড়ী রয়েছে। তার ধার শোধের কিস্তি দেওয়া এখনও শেষ হয়নি।' সাহেব নাছোড়বান্দা। বললে, 'Anyway, please have a look inside'। আমি দেখছি সাহেব আমাকে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' এই চার্বাকীয় দর্শন গেলাতে চাইছে। তার আমাকে 'ড্যাম্‌চি বাবু' মনে করার কোন কারণ নেই। বুঝতে পারছি না সে তবু কেন 'একবার তো see, see তে তো no fault' করে যাচ্ছে। ভাবলাম এত করে যখন বলছে, তখন একবার দেখাই যাক বাড়ীর ভিতরটা। ওহ্, আপনাদের বুঝি ড্যাম্‌চি বাবু' আর 'একবার তো see, see তে তো no fault' এর কথা জানা নেই? তা হলে এই বেলা ওগুলোর কথা বলে নিই।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব অনেকদিন হল শেষ হয়েছে। বড় শহর আর ট্যুরিস্ট স্পট ছাড়া এখন আর সাহেব-মেমদের এদেশে তেমন একটা দেখা যায় না। এই রকম সময়ে বাংলার কোন এক মফস্বল শহরে কোন কাজে এক সাহেব এসে হাজির। সেই সাহেব বাজারে গেছে দৈনন্দিন জিনিষপত্র কিনতে। এক মাছের দোকানে সে দেখে অনেকগুলো জ্যান্ত মাছ একটা বড় গামলার জলে খলবল করছে। সাহেব মাছগুলো দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'হাউ মাচ?' মাছওয়ালীর সপ্রতিভ উত্তর, 'মাগুর মাছ – পাকা!' মাছওয়ালীর বছর পনেরোর ছেলেটা বেশ চটপটে। সে বলল, 'রাইপ!' সে ইস্কুলে ছয়-সাত ক্লাস অব্দি পড়েছিল। সাহেব মাগুর মাছের কাঁচা-পাকা কি বুঝল জানিনা, সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'হাউ মাচ আ কিলো?' কিলো শুনে ছেলেটা আন্দাজ করল সাহেব মাছের দাম জানতে চাইছে। সে উত্তর দিল, 'ওয়ান কিলো, ওয়ান হান্ড্রেড রুপি।' সাহেব দাম শুনে বলল, 'ড্যাম্ চিপ!' আর গোটা দুই জ্যান্ত মাগুর মাছ কিনে শিস্ দিতে দিতে বাড়ী গেল।

সাহেব এই রকম যে জিনিষের দাম শোনে তাতেই বলে 'ড্যাম্ চিপ!' এই করে বাজারে সাহেবের নাম হয়ে গেল 'ড্যাম্‌চি সাহেব'। আর একদিন বাজারে মিষ্টির দোকানে কাঁচের শো-কেসের মধ্যে মাটির হাঁড়িতে দই দেখে তার প্রশ্ন, 'হোয়াটস্ ডিস?' দোকানীর উত্তর, 'সুইট দই।' সাহেব সুইটটা বুঝল, দইটা নয়। আবার প্রশ্ন, 'হোয়াটস্ ডই?' মিষ্টির দোকানীর পেটে সাহেবকে দই কি জিনিষ বোঝানোর মত ইংরেজী বিদ্যে ছিল না। তখন তাকে উদ্ধার করল সেই সময় দোকানে উপস্থিত ইংরেজি জানা এক বায়োকেমিস্ট খদ্দের। সে একটু ভেবে সাহেবকে বলল, 'Doi is milk, sleeps with Lactobacilli whole night. Next morning becomes tight'। এই বর্ণনা শুনে সেদিন সাহেব দই কিনেছিল কিনা জানা নেই।

সাহেবের সাথে দোকানদারির এই রকম যখন অবস্থা তখন দু-একজন চালাক দোকানদার ভাবল ইংরাজীতে একটু আধটু কথা বলতে পারলে সাহেককে খদ্দের হিসাবে পাওয়া সুবিধা হবে। সাহেব-খদ্দের আকর্ষণের সেই ইংরাজীর একটি নমুনা।

"Oh Saheb, Please come to my shop. Take তো take, no take তো no take, once তো see, see তে তো no fault'! পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ্য করুন চালাক দোকানদার শুধমাত্র 'তে' আর 'তো' এই দুটো বাংলা শব্দ ব্যবহার করে কেমন নতুন ইংরাজী বানিয়েছে! একেই বোধহয় বলে necessity is the mother of invention! সাহেবদের দেশ এই নিউজিল্যান্ডে বাড়ী বিক্রির দালালেরও দেখছি একই policy। বাড়ী কিনব না জেনেও আমাকে বলছে – Please have a look inside। এতো দেখি পরশুরামের 'উলটপুরাণ'!

যাইহোক, গিড্ডে সাহেবের সাথে বাড়ীর ভিতরে গেলাম। সে বসার ঘর, খাবার জায়গা, রান্নাঘর, বাথরুম, বাচ্চাদের ঘর, কর্তা-গিন্নীর খাস কামরা, গেষ্টরুম ইত্যাদি সব ঘুরিয়ে দেখাল। একটা নতুন জিনিষ লক্ষ্য করলাম। প্রত্যেকটা ঘরের দেওয়ালে, মেঝে থেকে একটু উপরে, দরজার পাশেই একটা গর্ত – টেনিস বল সাইজের, একটা ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা। ওটি আগে অন্য কোন বাড়ীতে দেখিনি – কি কাজে লাগে বুঝতে পারলাম না। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে বলল ওটা ঘর ঝাঁট দেবার গর্ত। উত্তর শুনে আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখে সে বুঝল আমি কিছুই বুঝিনি। সে তখন আমাকে গ্যারেজে নিয়ে গেল। এক কোনে একটা ছোট সিলিন্ডার দেখিয়ে বলল এটা হল vacuum cleaner – permanently fixed। এটা চালিয়ে ঘরের ফুটোতে পাইপ লাগিয়ে দিলে ঐ পাইপ ঘরের ময়লা শুষে নেয়। ঘর পরিস্কার করার জন্য যন্ত্রটাকে টেনে টেনে প্রত্যেকটা ঘরে নিয়ে যাবার দরকার হয় না। আমি সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে মনে মনে বললাম, একটা নতুন জিনিষ শেখা হল।

আমাকে এইরকম যখন বাড়ী দেখানোর পালা চলছে তখন একটা চীনা পরিবার এল বাড়ী দেখতে। আমি সাহেবকে বললাম, 'তোমার আসল খদ্দেররা আসতে শুরু করেছে – আমি এবার কেটে পড়ি।' সাহেব আমাকে তার বিজিনেস কার্ড আর বাড়ীর বিবরণ দেওয়া একটা কাগজ দিয়ে বলল, 'দরকার হলে ফোন কোরো।' আমি সাহেবকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে বিদেয় হলাম।

পরের রবিবারের আড্ডায় গিড্ডে সাহেবের বাড়ী দেখানোর কথা বলছিলাম। সব শুনে ওয়েলিংটনের নতুন আগন্তুক জয়ন্ত আর বলাকা (কল্পিত দম্পতি) বলল, 'বাড়ীটা একবার দেখলে হত।' ওরা মিডল ইস্ট থেকে নিউজিল্যান্ডে অভিবাসী হয়েছে কিছুদিন আগে – কেনার জন্য বাড়ী খুঁজছিল। আমি ওদেরকে সাহেবের কার্ড আর বাড়ীর কাগজটা দিলাম। কয়েকদিন দেখাশোনার পর জয়ন্তরা ঐ বাড়ীটা কেনাই ঠিক করল।

তখন বুঝলাম সাহেবের 'Please have a look inside'এর মর্ম। কি করে এস্কিমোদের বরফ আর অনুপম খেরের মত মাথাজোড়া টাকওয়ালা লোককে হরেকরকম চিরুণী বিক্রী করতে হয় সাহেব তার কৌশল রপ্ত করেছে। সুতরাং আমাকে কাজে লাগিয়ে সে যে বাড়ী বিক্রী করতে পারবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! মাল বিক্রীর অন্য রকম কৌশলের সাথে পরোক্ষভাবে আগেও পরিচিত হয়েছি। সেইরকম একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

গতবার দেশ থেকে ফেরার সময় আমার বড়শালা তাপস একবোতল সাবানজল দিয়ে বলল, 'এটা নিউজিল্যান্ডে নিয়ে যাও – তোমার গাড়ী ধুতে কাজে লাগবে।' তাপস একটা ছোটখাট ব্যবসা করে। সেই সুবাদে বিভিন্ন কোম্পানীর কাছ থেকে মাঝে মধ্যে ছোটখাট gift পায়। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন কোম্পানী এটা দিয়েছে?' সে জানাল কোন কোম্পানী এটা দেয়নি, ও কিনেছে। তখন বোতলের গায়ে লেখা পড়ে বুঝলাম ওটা Amway কোম্পানীর Car wash liquid, আধ লিটারের বোতল – দাম ২০০ টাকা। যে লোকের ঘোড়া নেই তার এরকম জিন কেনার বাতিকের কারণ কি জিজ্ঞাসা করতে জানলাম তাপসের এক ব্যবসাদার বন্ধু হালে Amway কোম্পানীর agency নিয়েছে। সে ওটি গছিয়েছে। এমন push sell করেছে যে আমার ব্যবসাদার শালাও না বলতে পারেনি। যে লোকের মাথায় একগাছি চুল নেই তাকে 'সুবাসিত কেশতৈল' বিক্রীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সেই থেকে চেনাজানা কেউ Amway কোম্পানীর agency নিয়েছে শুনলে ভয়ে ভয়ে থাকি। ভাবি, এই না কোন একটা বেশি দামের অদরকারী ফালতু জিনিষ গছিয়ে দিয়ে যায়।

যাইহোক, লেখাটা, ভুল বললাম – word processing টা, এখন শেষ করি। সদর দরজায় কেউ ঠক্ ঠক্ করছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক বা কোন সেলসম্যান হতে পারে। ধর্মপ্রচারকরা বাড়ীতে প্রায়ই আসে কিনা।

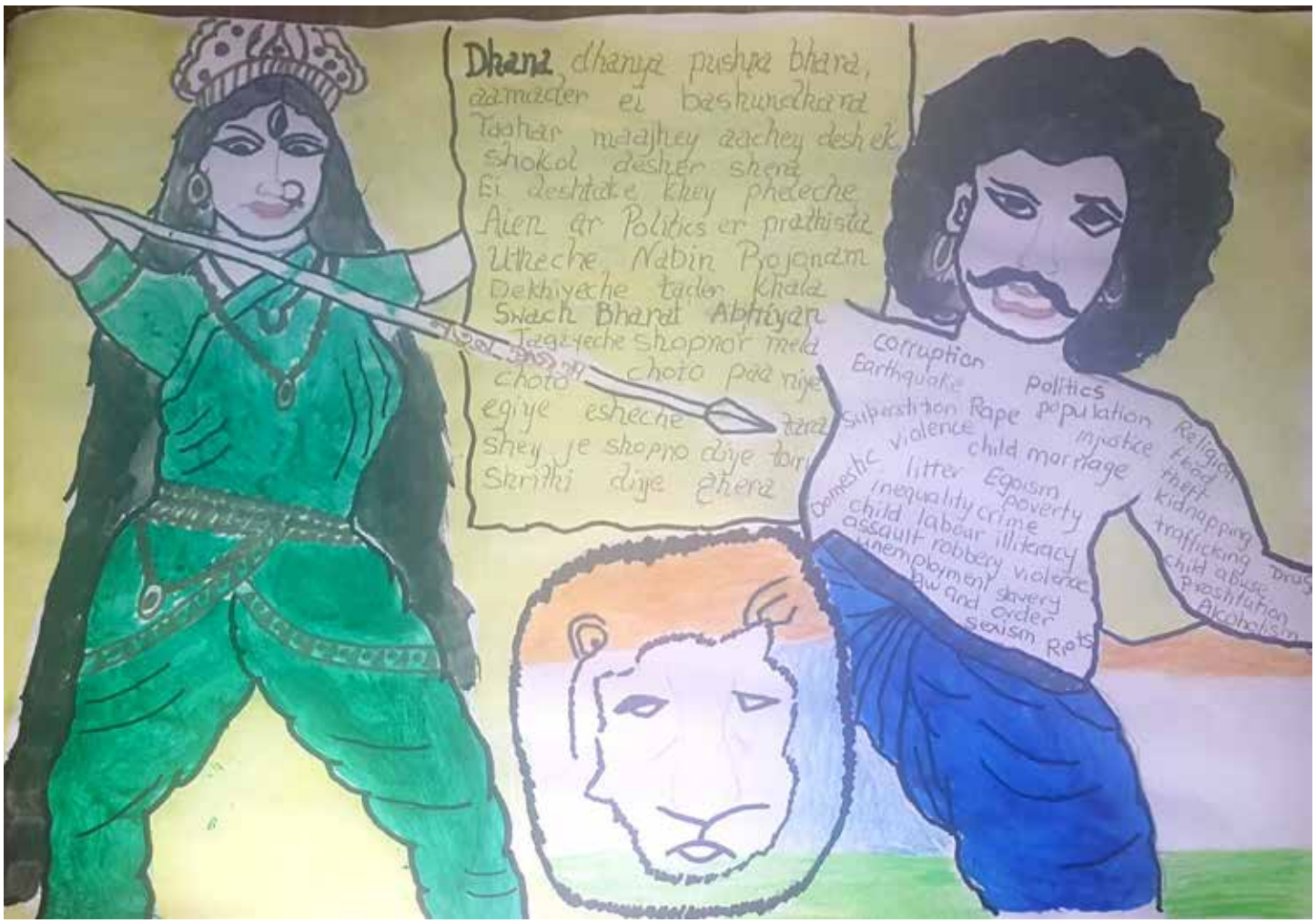

Illustration by: Nirmita Ghosh

Photograph collage by: Ryan Ghosh

প্রকৃতি ধ্বংসকারী অসুরদের বিনাশ করো মা

সৌম্য গাঙ্গুলী

পৌরাণিক মতে, রামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন রাবণ নামক দুষ্ট অসুরকে বধ করার ক্ষেত্রে মা দুর্গার আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। যুগ বদলেছে। ত্রেতার বদলে এখন কলিযুগ। পুজো এখন পরিণত হয়েছে শারদ উৎসবে। শুধু পুজোর রূপই বদলায়নি, সঙ্গে আরও বদল হয়েছে। এখন পুজো এলেই বাঙালিরা, বিশেষ করে কলকাতার মানুষ সবুজ ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে। পুজোর মাসখানেক আগে থাকতেই শয়ে শয়ে গাছের ডাল-পালা ছাঁটা শুরু হয়। কেননা, গাছের ডাল বিজ্ঞাপনের বড় বড় হোর্ডিংয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে! গত কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে এই ঘটনা। প্রকৃতি মাকে ধ্বংস করে দুগা মায়ের পুজোকে সামনে রেখে বাণিজ্য।

এবার উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। পুজোর আগে অনেকেই ভাল নেই। প্রকৃতির রোষে বহু মানুষের বহু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, প্রকৃতি এভাবে রুষ্ট হল কেন? প্রকৃতি প্রতিশোধ নিল কেন? প্রকৃতি মানুষকে বদলে দিয়েছে, না মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা বদলেছে? নদীর গতি পরিবর্তন, বড় বড় বাঁধ, নদীর বুক থেকে ক্রমাগত বালি তুলে জলধারণের ক্ষমতা কমানো, গাছ কেটে মাটি ক্ষয়, পুকুর বুজিয়ে জল যাওয়ার বন্ধ করার যে পাপ আমরা করেছি, তার ফল ভোগ তো করতেই হবে। ভারতে যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও দেশে হয়নি। বাংলাদেশও এ বিষয়ে অনেক সজাগ।

অনেকেই গঙ্গার পাশ দিয়ে গেলেই হাত জোড় করে প্রণাম করেন। তারপর সেই গঙ্গার জলেই নানারকম নোংরা ফেলেন। পুরানের হনুমানের পুজো করা হয়, আর গাছ কেটে, জঙ্গল সাফ করে হনুমান, বানরদের বাসস্থান ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সবুজ বাঁচানোর কথা বিজ্ঞাপনেই দেখা যায়, বাস্তবে প্রতিফলন নেই।

এবারের পুজোয় তাই মায়ের কাছে প্রার্থনা, তোমার প্রকৃতিকে যারা বিনষ্ট করছে, সেই অসুরদের সাজা দাও। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখো। অনেক ক্ষতি হয়েছে, প্রকৃতির আর ক্ষতি করতে দেওয়া যাবে না মা।

কথায় কথায় 'অহনা'

আলোচনায় উপাসনার সাথে টিম অহনা

ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়ার বাসিন্দা দের জীবনে

সামগ্রিক ভাবে দুটো ইম্পরট্যান্ট ফ্যাক্টর হল – এক, dugga pujo দুই, cinema । এই দুটোকে কেন্দ্র করে যে বাঙালি র জীবন- ক্যালেন্ডারের পাতা বছরের পর ঘুরে চলেছে ,তা শুধু বাঙালি কেন আপামর ভারতবাসীই এক বাক্যে মানে। এই দুটো নাম বাঙালি জীবনের সাথে এই ভাবে জুরে গেলো কেন, তা দুর্গা পুজোর ক্ষেত্রে আলাদা করে ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই । আর সিনেমা , সেটা কেন এই রকম বাঙালি নামের 'পিছু পিছু ধায়ে'? সেটা কি, ১৮৯০ 'র প্রথম 'বায়োস্কোপ' টা কলকাতা শহরে দেখানো হয়েছিল বলে, নাকি সত্যজিৎ রায় -ঋত্বিক ঘটক যুগের বহু আগেই ১৯১৮ তেই বাংলা গোটা একটা পুর্ণ দৈর্ঘের বংলা সিনেমা বানিয়ে ফেলেছিল বলে?? কারণ যাই হোক, বাঙালি মাত্রেই যে ভালোবাসা আর ভালোলাগার লিস্টে বাড়ীতে বসে পড়ার 'বই' আর থিয়েটারে গিয়ে দেখার 'বই ' দুই ই থাকবে তা বোধহয় শুধুই নিখাদ সিনেমা প্রীতির কারণেই। এত গুলো কথা বলতেই হল কারণ বাঙালি দের সিনেমার প্রতি ভালোবাসা এতটাই যে কলকাতা থেকে এগারো হাজার একশো আটাত্তর কিলোমিটার দূরে বসেও বাঙালি বাংলা সিনেমা বানায়, বাংলা সিনেমা দেখে ।

রুপম চৌধুরী নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরে একটা বাংলা 'শর্ট –ফিল্ম' বানিয়েছে ফেলেছে। কলকাতা থেকে এত দূরে প্রবাসী বাঙালি কাস্ট আন্ড ক্রু নিয়ে তৈরি এই

সিনেমা ।কলকাতায় এই বছর পুজোয় যখন একসাথে ৬টা সিনেমা রিলিস করছে, তখন কলকাতা থেকে এত দূরে রুপম আর গোটা টিমের সাথে বসে "অহনা" নিয়ে কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে এইটা ভেবে যে, এইবার পুজোয় আমাদের কাছেও একটা নতুন বাংলা সিনেমা

আছে , যা আমাদের নিজেদের তৈরি ...

প্রথমেই শুরু করি রুপম কে দিয়ে , আচ্ছা রুপম তুমি আমাদের একটু শুরুর কথা বলো ... "অহনা" , তোমার শর্ট- ফিল্ম সেটা করার কথা তোমার মাথায় এলো কি করে?

রুপমঃ অহনার গল্প প্রথম মাথায় আসে ফিল্ম স্কুল এর শেষের দিকে, মানে গত বছর অগাস্ট নাগাদ | প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল যে ফিল্ম স্কুল শেষ হয়ে গেলে এখানে বাংলাতে শর্ট ফিল্ম ডাইরেক্ট করবো। হয় নিজের গল্প অথবা সাহিত্য থেকে এডাপ্টেড | অহনা গল্পটি লেখার পর অনেক ভেবেছি, এটা এখানে বানাবো না কলকাতায় বানাবো | তারপর আমি এবং দেবলীনা ঠিক করলাম "অহনা" এখানেই হবে। অহনা বানানোর আগে আমি বেশ কিছু শর্ট ফিল্ম-এ কাজ করি ফ্রীলান্সার হিসেবে তাই আগেই থেকে অনেক গুছিয়ে এবং প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম | প্রথমবার স্ক্রিপ্ট পরেই সব অভিনেতারা রাজি হয়ে যান এবং তারপর এক্টিং ওয়ার্কশপ, টেকনিকাল ওয়ার্কশপ এবং কলকাতায় সুদীপ্তর সাথে অডিও নিয়ে কাজ শুরু হয়ে ৩৬ ঘন্টা শুটিং হয়েছিল এবং দ্বিতীয় দিনের সকাল ৭-তার লোকেশন আগেরদিন রাত ৩-টের সময় আমি ক্যানসেল করি | সে এক দারুন অভিজ্ঞতা | এই ভাবেই শুরু হয়ে New Zealand - এ বানানো সর্বপ্রথম ছবির পথ চলা |

- এই ছবির বিষয় টা কি? এটা কি "ইমিগ্রেশন হোম সিকনেস" নিয়ে তৈরি কনো ছবি?

রুপমঃ যখন থেকে ঠিক করেছিলাম যে অকল্যান্ড এ বাংলা ছবি বানাবো, তখন থেকেই নিজেকে বলেছিলাম যে 'ইমিগ্রেশন হোমসিকনেস' নিয়ে কোনোদিন কাজ করবোনা কারণ সেই

সেই ব্যাপারটি খুব clichéd | কলকাতায় থাকলে যেরকম ভাবে ছবি বানাতাম ঠিক সেরকমই বানাবো এখানে, তফাৎ এটাই যে প্রবাসী বাঙালি জীবনধারার সাথে মানানসই করে তুলতে হবে।

- দেবোলিনা ও এখানে আছে , দেবোলীনা তুমি তো এই সিনেমার এক্সেকিউটিভ প্রোডিসার ছিলে , তুমি যদি আমাদের অহনার গল্পটা একটু বলো -

দেবলীনাঃ অহনা চ্যাটার্জী কলকাতার মেয়ে যে বেশ কিছু বছর হলো তার বর সৌমিল চ্যাটার্জী-র সাথে অকল্যান্ড-এ থাকে | ৩১স্ট মার্চ ২০১৬ কলকতায় এক ফ্লাইওভার-এর অংশ ভেঙে পরে এবং প্রচুর লোক আহত এবং নিহত হন | অহনা সেই ঘটনা-কে কেন্দ্র করে এবং সেই ঘটনা তে ছোটবেলার প্রিয় বান্ধবীকে হারিয়ে অকল্যান্ড এ অহনা চ্যাটার্জী-র মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়ে এবং তার জীবনের চাওয়া পাওয়া গুলো কিভাবে বদলে যায় সেটা নিয়েই ফিল্ম-টি তৈরী |

- বাহ! বেশ, সমসাময়িক আর মননশীল গল্প , এই গল্পে অভিনয় করাও বেশ শক্ত কাজ। রুপম তোমার সিনেমায় নাম ভুমিকায় ও অন্যান্য চরিত্রে কে কে অভিনয় করেছে?

রুপমঃ অহনা চ্যাটার্জী-র ভূমিকায় নির্মিতা ঘোষ, অহনার বর সৌমিল চ্যাটার্জী'র ভূমিকায় সান্তনু ঘোষ, অকল্যান্ড-এ অহনার সব থেকে কাছের বান্ধবী রিতু-র ভূমিকায় অর্পিতা চন্দ এবং রিতুর বর-এর ভূমিকায় দেবানন্দ দেব | ছবিটির ক্যামেরা করে Nelson Savage যে আমার সাথে ফিল্ম স্কুল এ ছিল এবং লোকেশন অডিও করে Nik Barthow এবং Riteish Vaghela |

এই প্রত্যেকজনই অত্যন্ত প্রতিভাশীল এবং খুব ভালো কাজ করেছে | নির্মিতা এবং শান্তনু বহু বছর ধরে অকল্যান্ড-এ থিয়েটার করে এসেছে তাই ওরা অভিনয়-টা অনেকটাই বোঝে, তবে থিয়েটার এবং সিনেমা দুটো অনেক আলাদা তাই সেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও তাদের যেতে হয় | নির্মিতা এবং শান্তনুর সাথে আমি নাটক এ কাজ করেছি তাই তাদের অভিনয় ভালো করে জানি | তা ছাড়া সবাই বন্ধু এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুব সহযোগিতা করেছে, এখানে আরেকজনের নাম নেওয়া উচিত যে আমাদের দরকারে খুব সাহায্য করেছে সে হলো তাপসী দেব |

- এইবার তাহলে এইবার নির্মিতাই বলুক ক্যামেরার সামনে প্রথম বার অভিনয় ওর কেমন লাগল -

নির্মিতাঃ এক্সাইটিং আন্ড মেমোরেবল । একদম অন্যরকম অভিজ্ঞতা, স্পেশালি ডিসেম্বর মাসের গরমে মধ্যে একটার পর একটা শট এন জি দেওয়ার পরেও যখন দেখেছি সবাই ধৈর্য ধরে হাসি মুখে আমায় encourage করে যাচ্ছে তখন সত্যিই নিজেকে blessed মনে হয়েছে ।

নির্মিতা এই স্ক্রিপ্ট টা তোমায় কি ভাবে inspire করেছিল এই ছবি টা করতে ?

নির্মিতাঃ আমার স্ক্রিপ্ট টা খুব আপিলিং লেগেছিল আমি নিজের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছি ।আমার মনে হয় প্রতিটি মেয়েকেই জীবনের কোন না কোন সময় এই থট – প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

- আর্পিতা , তোমারো কি তাই মনে হয়? তুমি তো এই ছবিতে অহনার বন্ধু, তুমি তোমার এক্সপিরেন্স যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করো –

অর্পিতাঃ আমি নির্মিতার সাথে এক মত । অহনার ডিলেমা বা মানষিক দ্বন্দ্ব সব মেয়েই তাদের জীবনে বিভিন্ন ভাবে ফেস করে থাকে । আর এই শর্ট ফিল্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অন্যতম ভালো অভিজ্ঞতা গুলোর মধ্যে একটা।

- বাহ! কিন্তু রুপম কলকাতা থেকে এত দূরে একটা শর্ট -ফিল্ম করতে কিছু তো সমস্যা ফেস করতে হয়েছেই, কারণ ওখানে আর এখানে কাজের পদ্ধতি যেখানে একদম আলাদা।

রুপমঃ সমস্যা নয় তবে প্রচুর অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়েছিলাম | এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উইকেন্ড এ শুটিং করতে হয় তাই প্ল্যানিং-টাও খুব ভালো করতে হয় | ইন্ডাস্ট্রির মতো টানা শুটিং করা সম্ভব হয়না | কিন্তু প্ল্যানিং এর বাইরেও অনেকসময় অপ্রত্যাশিত বাধা চলে আসে | এই বাধা গুলো আসা ভালো বলে আমি মনে করি - অনেক কিছু শেখায় এবং চলার পথ-টা স্মরণীয় করে তোলে |

নির্মিতাঃ রুপম এর কথা শুনতে শুনতে আমার একটা কথা মনে পরল যেটা আমি না বলে পারছি না। আমাদের এই ছবির বেশ বড় অনেকটা অংশ বিচে শুটিং হয়েছে , এরকমই একদিন খুব ইনটেন্স একটা সিনের শুটিং এ আমরা সবাই যখন কনসেনট্রেট করে সিনটা শ্যুট স্টার্ট করব ঠিক তখনি কত গুলো ডার্ট বাইক চলে আসে বিচে আর প্রচন্ড আওয়াজ করে আমাদের চারপাশে ঘুরতে শুরু করে। রুপম অনেক ধৈর্য ধরে চুপ করে অপেক্ষা করে ওদের থেমে যাওয়ার ... কিন্তু ওরা থামে না, তার জন্য আমাদের বেশ অনেকটা সময় নষ্ট হয় কিন্তু shoot ক্যান্সেল না

ক্যান্সেল না করে ঐ আওয়াজের মধ্যেই আমাদের সেদিন সিনটাশ্যুট করি।

দেবলীনাঃ আর সেটা বেশ ভালো ও হয়েছে। ওয়ান অব থে বেস্ট সিন এর একটা ওই সিন টা।

- আমার এখন তো বেশ মজাই লাগল শুনে ডার্ট বাইকের গল্পটা , তবে সেইসময় যে তোমাদের বেশ অসুবিধায় পরতে হয়েছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছি। রুপম বাংলা ছবিতে সবসময়ই গান একটা ভাইটাল রোল প্লে করে, তোমার ছবি তে কি কনো গান আছে ?

রুপমঃ হ্যা আছে , একটা রবীন্দ্রসংগীত আছে যেটা গেয়েছেন বাসুপর্ণা চৌধুরী। বাসুপর্ণার গান-এর খুব প্রশংসা পেয়েছি | itunes এবং Amazon এর মতো জায়গায় গানটি সাফল্য পেয়েছে | আর ছবিটির পুরো অডিও, background music এবং গান - সব কিন্তু কলকাতায় করা আমার নিজেস্ব ষ্টুডিও - ষ্টুডিও NMP te | Background music করেছে সুদীপ্ত সরকার। অহনার পোস্ট প্রোডাকশান এর কাজ শেষ হতে আমার ২- ৩ মাস সময় লেগেছে।

- এই ছবির স্পন্সরার কে?

রুপমঃ আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন হাউস Motif ফিল্মস ব্যানার -এ | কোনো স্পনসর ছাড়া তৈরী করা হয়ে যাতে ছবিটির ভাগ্য বাইরের কোনো ফ্যাক্টর-এর ওপর ভরসা করে না থাকে।

- অহনা তো কিছু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য ও সিলেক্টেড হয়েছে , সেগুলো কি কি আর কোথায় কোথায়?

রুপমঃ অহনা প্রথম সিলেক্ট হয় Noida ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, তারপর কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং Los Angeles Cinefest | এর পর নতুন করে পাঠানো হয়নি কোথাও এবং আবার করে পাঠানো হবে সামনের মাস থেকে | Noida ফেস্টিভ্যাল-এ আমরা Neeraj Pandey -এর এক ফিল্ম এর সাথে একই গ্রুপ এ ছিলাম, কলকাতায় আমাদের সিলেক্ট করেন সন্দীপ রায় | এই দুটি আমার কাছে খুব বরো পাওয়া | এছাড়া কলকাতায় কিছু মানুষ দেখেছেন এবং তারাও খুব প্রশংসা করেছে | অনলাইন প্রমোশন এ খুব ভালো ফিডব্যাক পেয়েছে অহনা | আরও ফেস্টিভ্যাল-এ পাঠানো হবে |

- এইবার সবচেয়ে ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন যেটা আমার একার না অনেকেরই প্রশ্ন তোমার কাছে, আমরা এখানে কবে দেখতে পাব অহনা ?

রুপমঃ নিশ্চই দেখতে পারবে | খুব তাড়াতাড়ি | প্ল্যানিং চলছে।

- অহনার পরে কি নতুন কনো কাজ শুরু করেছ?

রুপমঃ প্রতি ৬ মাসে একটি ছবি তৈরী করবো বলে ঠিক করেছি | পরের ছবির শুটিং শেষ, পোস্ট প্রোডাকশন চলছে | এই দুটি ছবি অকল্যান্ড-এর বাঙালিদের একসাথে দেখানোর পরিকল্পনাও চলছে।

ডিরেক্টর রুপম ও তার আগামী কাজ ও অতি অবশ্যই অহনার জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।

Shri Ram Mandir

Opening Hours 7.30 am to 8.30pm

Bhagwan Shayan on Weekdays from 12pm-4pm

Morning Arti 8.15am Evening Arti 7.15pm

Bhagwat Pravachan on Sunday's from 10.30-11.30am followed by Arti and Mahaprasad

Tuesday's Ramayan from 7.30pm

Friday's Kirtan from 7.30pm

copiesplus

Copy. Print. Stationery.

1248 Dominion Road
Mt. Roskill
Auckland - 1041
Ph. 09-6207023

Special Colour prints *50 or more **19c** ea

Photocopy	Fax & Email
Plan Print	Poster Print
Flyer Print	Business Cards
Brochures	Photo Print
Lamination	Scans

Business Cards
from
$18.99 inc. GST

To get a free quote :

E-mail us:
info@copiesplus.co.nz

Website:
www.copiesplus.co.nz

Customer satisfaction is our priority.

শুভ শারদীয়া

এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে। চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে।।

Eco Travels
For All Your Travel Solutions

www.ecotravels.co.nz

রবীন্দ্রনাথ ও বাউল গান

-রানী আকলিমা

"তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে?"
চিরকালের সুরের কাঙ্গাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই আকুতি আমরা দেখতে পাই তাঁর গোটা সঙ্গীতময় সত্ত্বায় । রত্ন সংগ্রহ করার মতন করে কবি সুর সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন সময় ভ্রমনকালে ,বিদেশী লোকজ সুর অথবা হিন্দী খেয়াল, ধ্রূপদ, ধামার কিংবা বাউল কীর্তন ইত্যাদি নানা সুর নানান সময় তাকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করেছে । আবার এমনও হয়েছে যে, কেউ গান খানি গলায় তুলে এনে কবি কে শুনিয়েছে আর তিনি সেই সুর টি তাঁর কথাতে আরোপ করে দিলেন। এইভাবেই সৃষ্টি হল রবীন্দ্রনাথের ভাঙ্গা গান। কবিগুরুর ভঙ্গা গানের রত্ন ভান্ডারে যেই রত্ন সমূহ জ্বলজ্বল করছে তাদের একটি হল বাংলাদেশের বাউল গান। বাউল গানের সুরে নিজের কথা বসিয়ে অপূর্ব সব সঙ্গীত সৃষ্টি ক'রে গেছেন তিনি ।"আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে ", কুষ্টিয়ার গগন হরকরার বিখ্যাত এই গানটির সুর আর সরলতা কবিকে এতই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল যে এর সুরে কথা বসিয়ে কবি সৃষ্টি করে ছিলেন কালজয়ী গান "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"। আমরা সবাই জানি গানখানি বাংলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত । বাউল গান সম্পর্কে কবির উপলব্ধি হচ্ছে, এতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব আছে তেমনি আছে ভক্তিরস এবং কাব্যের পরিমিত মিশ্রন। কবি আরো বলেছেন বাউল গান এক "অপূর্ব" লোক-সাহিত্য।

বাউল সম্প্রদায় গানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন দর্শন ও ভাবদর্শন তাঁর মনকে আর কবির সৃষ্টিকে ভীষন ভাবে আলোড়িত করেছিল। বাউল গানের ভাষায় সরলতা ও ভবের গভীরতা ও সুরের দরদ কে "অতুলনীয় " বলে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কৃত্রিমতা ও বিকৃতির আশংকা থাকা স্বত্তেও বাউল গানের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা কবি উল্ল্যেখ করে গেছেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মহম্মদ মন্সুরুদ্দিনের বাউল সঙ্গীত সংগৃহিত 'হারমনি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে কবিগুরু যা বললেন তা তাঁর ভাষায় উদ্ধৃত করা হল, "আমাদের দেশে যারা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু- মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাদের শিক্ষা।কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরুন্ত মানুষের অন্ততর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল- সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি – এই জিনিস হিন্দু – মুসলমান উভয়েরই ; একত্র হয়েছে অথচ কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়নি ; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধূর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কন্ঠ মিলেছে , কোরন পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙ্গালাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরনা ইস্কুল- কলেজে অগোচরে আপনা আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। "

দেশের তৎকালীন- আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবিকে যেমন ভাবিত করেছিল তেমনি দেশের উপেক্ষিত অবহেলিত জনসাধারনের মধ্যে আত্মিক তপস্যা ও সত্য ভাষন তাঁকে মুগ্ধ করেছে যুগে যুগে কালে কালে।

Probasee Annual Play

Original Playwright: Badal Sircar ***Devised & Directed by: Amit Ohdedar***

A host of colourful characters of various shades including a paan chewing fun loving aunt, a highly strung director, two overzealous stage assistants, an aspirant actress, two candidly innocent children and several nervous actors of various dimensions take the audience on a hilariously funny ride that captures the joy and celebration of a small community getting together to have innocent fun!

Independence Day Celebration

Rabindra Nazrul Evening 2017

Probasee Bengalee Association of New Zealand organised an evening of songs, recitations and dance, paying tribute to the literary legends Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam. Participants of this programme included all age groups of our organisation.

FIRST property management

M 021703567 P 09 2148544 www.rentalsinauckland.co.nz

If you want a good tenant, talk to us.

Special Offer

If you have a rental property, receive a $60 rental appraisal, absolutely free.
$500 off your first year's fees if you sign up for our management service.
(Offer valid till 30th November 2017)

The First Property Management customer experience...

It is refreshing to find someone like Mohijit who is honest, courteous, reliable and always reachable. He has been managing our property for the past 10 years and has treated our home as his own. We wish him all the best and look forward to working with him for many years to come.

R K, Melbourne

Being new landlords we were very nervous in the beginning, not sure of how we would manage the whole process. Mohijit made the whole transition easy and seamless and put our minds at ease. Mohijit is very easy to deal with and very organised. Highly recommend.

Chiradeep and Sonali Banerjee
Auckland

Your peace of mind is our business

Greetings to one and all on the 25th Anniversary of Probasee's Durga Puja.

Best Compliments and Greeting for Dashera

from

RELIANZ FOREX

RELIANZ GROUP

RELIANZ TRAVEL

Call us on – 0508 411 111 (Toll Free) or visit any of our offices in Dominion Road, New Windsor, Sandringham Road, Queen Street, Queens Arcade, Manurewa or Papatoetoe

Emirates

THAI

CHINA SOUTHERN AIRLINES

SINGAPORE AIRLINES

HONGKONG AIRLINES 香港航空

malaysia airlines

Importers and Distributors of well known brands and quality FMCG products

Urja
Edible Oils, Rice, Flour, Mango Pulp, Spices, Rusks, Biscuits & Tea

Priya Gold
Biscuits & Cookies

MTR
Ready To Eat Meals, Pre-mixes & Almond Drinks

Rasoi Magic
Pre-mixes

Bikano
Snacks, Sweets & Frozen Foods

Frooti & Appy
Drinks

India Gate
Basmati Rice

Shan
Pre-mixes, Pink Salt, Pastes & Relishes

Midas
Papads, Chutneys, Pickles & Pastes

Tea4U
Pure Ceylon, Flavoured & GreenTeas

Jabsons
Flavoured Peanuts & Snacks

AB INTERNATIONAL LTD | *"Bringing Together a World of Goodness"*

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz